সূচীপত্র

সাপ্তাহিক আরাফাত

مجلة عرفات الأسبوعية

شعار التضامن الإسلامي

মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক

প্রতিষ্ঠাতা: আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)

www.weeklyarafat.com

৬৬ বর্ষ

সংখ্যা: ০১-০২

০৭ অক্টোবর-২০২৪

সোমবার

ঐতিহাসিক বজরা শাহী মসজিদ, নোয়াখালী

সাপ্তাহিক
আরাফাত
প্রতিষ্ঠাকাল- ১৯৫৭
মুসলিম সংস্কৃতির আহ্বায়ক

عرفات الأسبوعية
شعار التضامن الإسلامي
مجلة أسبوعية دينية أدبية ثقافية وتاريخية الصادرة من مكتب الجمعية

প্রতিষ্ঠাতা : আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)
সম্পাদকমন্ডলীর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি : প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুল বারী (রহ)

গ্রাহক ও এজেন্ট হওয়ার নিয়মাবলী

বছরের যে কোনো সময় গ্রাহক হওয়ার যায়। ছয় মাসের কমে গ্রাহক করা হয় না। প্রতি সংখ্যার জন্য অগ্রীম ১০০/- (একশ টাকা) পাঠিয়ে বছরের যে কোন সময় এজেন্সি নেওয়া যায়। ১০ কপির কমে এজন্সি দেওয়া হয় না। ১০-২৫ কপি পর্যন্ত ২০%, ২৬-৭০ কপির জন্য ২৫% এবং ৭০ কপির উর্দ্ধে ৩০% কমিশন দেওয়া হয়। প্রত্যেক এজেন্টকে এক কপি সৌজন্য সংখ্যা দেওয়া হয়। জামানতের টাকা পত্রিকা অফিসে নগদ অথবা বিকাশ বা সাপ্তাহিক আরাফাতের নিজস্ব একাউন্ট নাম্বারে জমা দিয়ে এজেন্ট হওয়া যায়।

ব্যাংক একাউন্টসমূহ

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি.
নওয়াবপুর রোড শাখা
সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর-২০৫০১১৮০২০০২৮৫৬০০
যোগাযোগ : ০১৯৩৩৩৫৫৯০১

বিকাশ নম্বর
০১৯৩৩৩৫৫৯০৫
চার্জসহ বিকাশ নম্বরে টাকা প্রেরণ করে উক্ত নম্বরে ফোন করে নিশ্চিত হোন।

সাপ্তাহিক আরাফাত
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি. বংশাল শাখা
সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর-২০৫০১৭৯০২০১৩৩৫৯০৭
যোগাযোগ : ০১৯৩৩৩৫৫৯১০

মাসিক তর্জুমানুল হাদীস
শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লি.
বংশাল শাখা
সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর-৪০০৯১৩১০০০০১৪৪০
যোগাযোগ : ০১৯৩৩৩৫৫৯০৮

বিশেষ দ্রষ্টব্য : প্রতিটি বিভাগে পৃথক পৃথক মোবাইল নম্বর প্রদত্ত হলো। লেনদেন-এর পর সংশ্লিষ্ট বিভাগে প্রদত্ত মোবাইল নম্বরে ফোন করে নিশ্চিত হওয়ার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

আপনি কি কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ মোতাবেক আলোকিত জীবন গড়তে চান?
তাহলে নিয়মিত পড়ুন : মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক
সাপ্তাহিক আরাফাত
মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক
ও কুরআন- সুন্নাহ'র আলোকে রচিত জমঈয়ত প্রকাশিত বইসমূহ

যোগাযোগ
৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ি, ঢাকা- ১২০৪
ফোন : ০২-৭৫৪২৪৩৪, মোবইল : ০১৯৩৩-৩৫৫৯১০
www.jamiyat.org.bd

مجلة عرفات الأسبوعية

شعار التضامن الإسلامي

সাপ্তাহিক আরাফাত

মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক

ধর্ম-দর্শন, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ইতিহাস-ঐতিহ্য বিষয়ক সাপ্তাহিকী

প্রতিষ্ঠাকাল - ১৯৫৭
রেজি - ডি.এ. ৬০
প্রকাশ মহল - ৯৮, নবাবপুর রোড,
ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ

প্রতিষ্ঠাতা: আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)

* বর্ষ : ৬৬
* সংখ্যা : ০১-০২
* বার : সোমবার

◈ ০৭ অক্টোবর-২০২৪ ঈসায়ী
◈ ২২ আশ্বিন-১৪৩১ বঙ্গাব্দ
◈ ০৩ রবিউস সানি-১৪৪৬ হিজরি

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি
অধ্যাপক ডক্টর আব্দুল্লাহ ফারুক

সম্পাদক
আবু আদেল মুহাম্মাদ হারুন হুসাইন

সহযোগী সম্পাদক
মুহাম্মদ গোলাম রহমান

প্রবাস সম্পাদক
মুহাম্মাদ রফিকুল ইসলাম মাদানী

ব্যবস্থাপক
রবিউল ইসলাম

উপদেষ্টামণ্ডলী
প্রফেসর এ. কে. এম. শামসুল আলম
মুহাম্মদ রুহুল আমীন (সাবেক আইজিপি)
আলহাজ্জ মুহাম্মদ আওলাদ হোসেন
প্রফেসর ড. দেওয়ান আব্দুর রহীম
প্রফেসর ড. আ. ব. ম. সাইফুল ইসলাম সিদ্দিকী
অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ রঈসুদ্দীন

সম্পাদনা পরিষদ
প্রফেসর ড. আহমাদুল্লাহ ত্রিশালী
উপাধ্যক্ষ ওবায়দুল্লাহ গযনফর
প্রফেসর ড. মো. ওসমান গনী
ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী
উপাধ্যক্ষ আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ
মুহাম্মদ ইবরাহীম বিন আব্দুল হালীম মাদানী

যোগাযোগ

সাপ্তাহিক আরাফাত

জমঈয়ত ভবন, ৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ী, বিবির বাগিচা ৩নং গেইট, ঢাকা-১২০৪।

সম্পাদক	: ০১৭৬১-৮৯৭০৭৬	বিপণন অফিসার	: ০১৯৩৩-৩৫৫৯১০
সহযোগী সম্পাদক	: ০১৭১৬-৯০৬৪৮৭	কম্পিউটার বিভাগ	: ০১৯৩৩-৩৫৫৯০৭
ব্যবস্থাপক	: ০১৯৩৩-৩৫৫৯০১	টেলিফোন	: ০২-৭৫৪২৪৩৪

weeklyarafat@gmail.com
www.weeklyarafat.com
jamiyat1946.bd@gmail.com

মূল্য : ২৫/-
(পঁচিশ) টাকা মাত্র।

www.jamiyat.org.bd
f/shaptahikArafat
f/group/weeklyarafat

©AH

مجلة عرفات الأسبوعية

تصدر من المكتب الرئيسي لجمعية أهل الحديث ببنغلاديش

٩٨ نواب فور، داكا-١١٠٠.

الهاتف: ٠٢٧٥٤٢٤٣٤، الجوال: ٠٩٣٣٣٥٥٩٠١

المؤسس: العلامة محمد عبد الله الكافي القريشي (رحمه الله تعالى)

الرئيس المؤسس لمجلس الإدارة:

الفقيد العلامة د. محمد عبد الباري (رحمه الله تعالى)

الرئيس الحالي لمجلس الإدارة:

الأستاذ الدكتور عبد الله فاروق (حفظه الله تعالى)

رئيس التحرير: أ/أبو عادل محمد هارون حسين

গ্রাহক চাঁদার হার (ডাকমাশুলসহ)

দেশ	বার্ষিক	সান্মাসিক
বাংলাদেশ	৭০০/-	৩৫০/-
দক্ষিণ এশিয়া	২৮ U.S. ডলার	১৪ U.S. ডলার
এশিয়ার অন্যান্য দেশ	৩০ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
সিঙ্গাপুর	৩৫ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া ও ব্রুনাই	৩০ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
মধ্যপ্রাচ্য	৩৫ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
আমেরিকা, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়াসহ পশ্চিমা দেশ	৫০ U.S. ডলার	২৬ U.S. ডলার
ইউরোপ ও আফ্রিকা	৪০ U.S. ডলার	২০ U.S. ডলার

“সাপ্তাহিক আরাফাত”

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড

বংশাল শাখা: (সঞ্চয়ী হিসাব নং- ১৩৩৫৯)

অনুকূলে **জমা/ডিডি/টিটি/অনলাইনে** প্রেরণ করা যাবে।

অথবা

“সাপ্তাহিক আরাফাত”

অফিসের বিকাশ (পার্সোনাল): ০১৯৩৩ ৩৫৫ ৯০৫

নম্বরে বিকাশ করা যাবে। উল্লেখ্য যে, বিকাশে অর্থ পাঠানোর পর কল করে নিশ্চিত হোন!

সূচিপত্র

- **সম্পাদকীয়** ০৩
- **আল কুরআনুল হাকীম:**
  - **জাহান্নাম থেকে বাঁচো ও পরিবার-পরিজনকে বাঁচাও!**
    আবূ সা‘আদ আব্দুল মোমেন বিন আব্দুস্ সামাদ- ০৪
- **হাদীসে রাসূল ﷺ:**
  - **সমকামীদের প্রতি মহান আল্লাহর লানত**
    গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক- ০৭
- **প্রবন্ধ:**
  - **বাংলাদেশে অলিগার্কতন্ত্র: উটপাখি ও কুমিরের বুকের চামড়ার জুতা**
    আবূ সা‘দ ড. মো. ওসমান গনী- ১১
  - **প্রবীণদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় রাসূল (ﷺ)**
    মুহাম্মদ গিয়াস উদ্দিন- ১৩
  - **মৌমাছি প্রসঙ্গ মহান আল্লাহর বিশেষ বড় নিয়ামত**
    অধ্যাপক মো. আবুল খায়ের- ১৮
  - **বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় সালাফদের ভূমিকা**
    মূল: শায়খ ড. উসামাহ ইবনু আত্বায়া আল উতায়বী (হাফিযাহুল্লা-হ)
    অনুবাদ: মাহফুজুর রহমান ইবনু আব্দুস সাত্তার- ২০
- **ক্বাসাসুল হাদীস:**
  - **রাসূল (ﷺ)-এর দেখা এক স্বপ্নের বর্ণনা**
    আবূ তাহসীন মুহাম্মদ- ২৩
- **বিশেষ মাসায়িল** ২৫
- **নিভৃত ভাবনা:**
  - **দলীয় শাসনের বীভৎস দুঃশাসন ও আশান্বিত প্রত্যাশার প্রস্তাবনা**
    মোহাম্মদ মাযহারুল ইসলাম- ২৬
- **বিশেষ প্রতিবেদন:**
  - **NTRCA’র দুর্নীতি: নিবন্ধনধারীদের জীবন দুর্বিষহ! প্রধান উপদেষ্টার হস্তক্ষেপ জরুরি**
    মো. আব্দুল মোমেন- ২৯
- **কিশোর ভুবন:**
  - **ছোটদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ (ﷺ)**
    সংকলনে: হাফেয মুহাম্মাদ আইয়ূব বিন ইদু মিয়া- ৩২
- **কবিতা** ৩৭
- **স্বাস্থ্য-সচেতনতা:**
  - **বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস ২০২৪ কর্মস্থলে মানসিক স্বাস্থ্য**
    মুহাম্মদ শামসুল আলম- ৩৮
- **ফাতাওয়া ও মাসায়েল** ৪১
- **প্রচ্ছদ রচনা** ৪৮

সম্পাদকীয়

সাপ্তাহিক আরাফাত-এর ৬৬তম বর্ষে পদার্পণ

সাপ্তাহিক আরাফাত নিরন্তর প্রকাশনার ৬৬তম বর্ষে পদার্পণ করলো– ফালিল্লাহিল হামদ! বাংলা ভাষায় গবেষণাধর্মী সাহিত্য-পত্রিকার নিয়মিত প্রকাশের এটি একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এটি আমাদের জাতীয় গৌরবের দাবিদার। যে দাবি এ দেশের সকল মুসলিমের; বিশেষত আহলে হাদীস জনগোষ্ঠীর। আমরা গর্বিত, আনন্দিত ও কৃতজ্ঞ। উপমহাদেশের খ্যাতিমান লেখক ও গবেষক আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শীর হাত ধরে এ সাপ্তাহিকীর সূচনা। তিনি ছিলেন কলম যুদ্ধের এক অকুতোভয় সেনানী। সে সময়ের প্রথিতযশা লেখকগণও সাপ্তাহিক আরাফাতে নিজেদের লেখনী প্রকাশ করে ধন্য হতেন। আর সর্বস্তরের বাংলা ভাষাভাষী মানুষ এ পত্রিকাটি হাতে পেতে অপেক্ষার প্রহর গুণতেন। এরপর সময়ের পালাবদলে অনেক উত্থান-পতন, অনুকূল-প্রতিকূল পথ মাড়িয়ে এই ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক আরাফাত-এর সম্পাদনা ও প্রকাশনার গুরু দায়িত্ব আমাদের মতো দুর্বল স্বন্ধে অর্পিত হয়। সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আমরা একান্ত নিষ্ঠার সাথে এ দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়ে চলেছি।

আমরা গর্বের সাথে বলতে পারি যে, দেশে যত ইসলামী পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে– বৈশিষ্ট্যগতভাবে সাপ্তাহিক আরাফাত সেগুলোর চেয়ে এগিয়ে। কেননা, এটিই একমাত্র পত্রিকা, যেটি সর্বপ্রাচীন ও যার প্রকাশনা নিরবচ্ছিন্ন। দ্বিতীয়ত: সালাফী আকীদাহ ও মানহাযের অকুণ্ঠ প্রচারক হিসেবেও এর অবস্থান শীর্ষে। বিষয়ভিত্তিক নিয়মিত সাপ্তাহিকী হিসেবেও এটি একমাত্র প্রকাশনা।

স্মর্তব্য যে, সম্পাদনা পরিষদ পত্রিকা মান-উন্নয়নের কারিগর। এর লেখনীসহ আধুনিকীকরণে সর্বদা সজাগ ও সচেষ্ট থাকা তাদের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। তবে বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর মুখপত্র হিসেবে জমঈয়তের সর্বস্তরের দায়িত্বশীলগণ এর প্রচার-প্রসারে এগিয়ে আসবেন- কেননা প্রতিটি দায়িত্বশীলের জন্য তা আমানতস্বরূপ।

৬৬বর্ষের সূচনালগ্নে জেলা জমঈয়তের দায়িত্বশীলদের প্রতি আমাদের উদাত্ত আহ্বান, আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল কোরায়শী (রাহিমাহুল্লাহ)-এর হাতে জন্ম নেওয়া এ সাপ্তাহিকীটি নিজ ঈমানী দায়িত্ব মনে করে, আপন আপন জেলার প্রতিটি কর্মীর হাতে পৌঁছানোর উদ্যোগ গ্রহণ করুন। কেননা, পত্রিকার গ্রাহক ও পাঠক বৃদ্ধিকরণ জেলা জমঈয়তের কার্যসূচির অন্তর্ভুক্ত একটি কাজ। পাশাপাশি নিজ নিজ জেলার সাংগঠনিক কার্যক্রমের প্রচার-প্রসার ও জনমানুষকে উদ্বুদ্ধকরণে জেলার সাংগঠনিক কার্যক্রমের রিপোর্ট আমাদের কাছে প্রেরণ করুন! আমরা জমঈয়ত সংবাদ হিসেবে তা আপনাদের প্রিয় সাপ্তাহিক আরাফাত-এ প্রকাশ করে এ মহান কাজে গৌরবের অংশীদার হব। পত্রিকার মান-উন্নয়নে আপনাদের মূল্যবান পরামর্শ ও সার্বিক সহযোগিত অব্যাহত রাখুন। নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহ তা'আলার মদদ লাভে ধন্য হব। নাসরুম মিনাল্লা-হি ওয়া ফাতহুন কারীব, ওয়া বাশ্‌শিরিল মু'মিনীন। ☒

আল কুরআনুল হাকীম

জাহান্নাম থেকে বাঁচো ও পরিবার-পরিজনকে বাঁচাও!

–আবূ সা'আদ আব্দুল মোমেন বিন আব্দুস্ সামাদ*

আল্লাহ তা'আলার অমিয় বাণী

﴿يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَآ اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ﴾

সরল বাংলা অনুবাদ

"হে মু'মিনগণ! নিজেদের এবং তোমাদের পরিবারবর্গকে রক্ষা করো সেই আগুন থেকে যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর। তাতে নিয়োজিত আছে কঠোর স্বভাব, কঠিন হৃদয় ফেরেশ্তাগণ, যারা আল্লাহর কোনো হুকুমে তার অবাধ্যতা করে না এবং সেটাই করে, যার নির্দেশ তাদেরকে দেওয়া হয়।"[১]

শাব্দিক বিশ্লেষণ

يَا শব্দটি حرف النداء অর্থাৎ- আহ্বান সূচক অব্যয়। اَلَّذِيْنَ এটি اسم موصول অর্থ- যারা শব্দটি দু'দিক معرفة (الاسماء موصولة - مبنى) হওয়ার কারণে এবং ال যুক্ত হওয়া فاصلة হিসেবে اَيُّهَا যুক্ত হয়েছে। আর اٰمَنُوْا অর্থ- তারা ঈমান এনেছে। قُوْٓا শব্দটি جمع مذكر আমরে হাযের। অর্থ- তোমরা রক্ষা করো বা বাঁচিয়ে রাখো। اَنْفُسَكُمْ অর্থ- তোমাদের নিজেদেরকে। وَ অর্থ- এবং আর اَهْلِيْكُمْ অর্থ- তোমাদের পরিবারবর্গকে। نَارًا অর্থ- আগুন। এখানে এ আগুন বলে জাহান্নামের অগ্নিকাণ্ডকে বুঝানো হয়েছে। قُوْدُ অর্থ- ইন্ধন هَا অর্থ- তার অর্থাৎ- সে আগুনের। النَّاسُ অর্থ- মানুষ ও الْحِجَارَةُ অর্থ- পাথর। عَلَيْهَا অর্থ- তার উপর নিয়োজিত আছে مَلٰٓئِكَةٌ অর্থ- ফেরেশ্তা। غِلَاظٌ অর্থ- কঠোর স্বভাব। شِدَادٌ অর্থ-কঠিন হৃদয়। لَّا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ অর্থ- তারা আল্লাহর অবাধ্য হয় না। مَآ اَمَرَهُمْ অর্থ- যা তাদের হুকুম করা হয়। يَفْعَلُوْنَ অর্থ- তারা করে مَا يُؤْمَرُوْنَ অর্থ- তাদেরকে যা নির্দেশ করা হয়।

সূরা ও আয়াতের পরিচয়

দরসে উল্লেখিত আয়াতটি মহাগ্রন্থ আল-কুরআনুল কারীমের ৬৬ নং সূরা, সূরা আত্ তাহ্রীম-এর ৬ নং আয়াত।

আলোচ্যবিষয়

উপর্যুক্ত আয়াতে মু'মিনদের পালনীয় অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি দায়িত্বের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। আর তা হলো– নিজেদেরকে সংশোধনের সাথে সাথে পরিবারের লোকদেরকেও সংশোধন করতে হবে। নচেৎ জাহান্নামের আগুনের ভয় দেখানো হয়েছে এবং জাহান্নামের শাস্তির ভয়াবহতা ও সেখানে নিয়োজিত ফেরেশ্তাদের কঠোর স্বভাবের বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

আয়াতের সংক্ষিপ্ত তাফসীর

(১) ইরশাদ হচ্ছে–

﴿نَارًا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا﴾

অর্থ- "হে মু'মিনগণ! নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবারবর্গকে আগুন থেকে রক্ষা করো।"

পূর্ববর্তী আয়াতের বর্ণনানুসারে যখন রাসূল (ﷺ)-এর বিবিগণেরও সৎকর্ম ও আনুগত্য ছাড়া গত্যন্তর (অন্য উপায়) নেই এবং রাসূলকেও তাঁর বিবিগণকে উপদেশ দিয়ে সৎকর্মে উদ্বুদ্ধ করতে আদেশ করা হয়েছে, তখন অবশিষ্ট সব উম্মতের উপরও এই কর্তব্য আরও জোরদার হয়ে গেছে যে, তারা যেন তাদের পরিবার-পরিজনের কর্ম ও চরিত্র গঠনে শৈথিল্য না করে। তাই আদেশ দেওয়া হয়েছে যে, হে মু'মিনগণ! নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবারবর্গকে রক্ষা করো) আয়াতে قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا বলে সাধারণ মুসলমানদেরকে বলা হয়েছে– "তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে জাহান্নামের অগ্নি থেকে রক্ষা করো"। অতঃপর জাহান্নামের অগ্নির ভয়াবহতা উল্লেখ করে অবশেষে এ কথাও বলা হয়েছে যে, যারা জাহান্নামের যোগ্য পাত্র হবে, তারা কোনো শক্তি, দলবল, খোশামোদ অথবা ঘুষের মাধ্যমে জাহান্নামে নিয়োজিত কঠোর প্রাণ ফেরেশ্তাদের কবল থেকে আত্মরক্ষা করতে সক্ষম হবে না। এই ফেরেশ্তাদের নাম 'যাবানিয়া'। اَهْلِيْكُمْ শব্দের

---

* *এমফিল গবেষক, জগন্নাত বিশ্ববিদ্যালয়।*

[১] *সূরা আত্ তাহ্রীম: ৬।*

মধ্যে পরিবার-পরিজন তথা স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি, গোলাম-বাঁদী সবই অন্তর্ভুক্ত। এমনকি সার্বক্ষণিক চাকর-নকরও এতে অন্তর্ভুক্ত থাকা অবান্তর নয়। এক রিওয়ায়াতে আছে, এই আয়াত নাযিল হলে পর 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আরয করলেন: হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)! নিজেদেরকে জাহান্নামের অগ্নি থেকে রক্ষা করার ব্যাপারটি তো বুঝে আসে (যে, আমরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকব এবং মহান আল্লাহর বিধি-বিধান পালন করব) কিন্তু পরিবার পরিজনকে আমরা কিভাবে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করব? রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন: এর উপায় এই যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে যেসব কাজ করতে নিষেধ করেছেন, তোমরা তাদেরকে সেসব কাজ করতে নিষেধ করো এবং যেসব কাজ করতে আদেশ করেছেন, তোমরা পরিবার-পরিজনকেও সেগুলো করতে আদেশ করো। এই কর্মপন্থা তাদেরকে জাহান্নামের অগ্নি থেকে রক্ষা করতে পারবে।[২]

জাহান্নাম থেকে বাঁচো ও পরিবার-পরিজনকে বাঁচাও: জাহান্নামের শাস্তি অত্যন্ত ভয়ানক! সেখানে রয়েছে বহু শাস্তির আয়োজন। বেশিরভাগ শাস্তিই দেওয়া হবে আগুন দিয়ে। যা দুনিয়ার আগুনের চেয়েও ঊনসত্তর গুণ বেশি উত্তপ্ত।[৩] এ আগুনের বর্ণনা স্বয়ং আল্লাহ সুবহা-নাহু তা'আলা দিয়েছেন এইভাবে–

﴿ٱلَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى ٱلْأَفْـِٔدَةِ ۝ نَارُ ٱللَّهِ ٱلْمُوقَدَةُ﴾

অর্থ- "আল্লাহর প্রজ্জ্বলিত আগুন। যা হৃৎপিণ্ড পর্যন্ত পৌঁছে যায়।"[৪]

তিনি আরো বলেন–

﴿سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُم بَدَّلْنَٰهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا۟ ٱلْعَذَابَ﴾

অর্থ- "আমি তাদেরকে এমন আগুনে নিক্ষেপ করব। তাদের চামড়াগুলো যখন জ্বলে পুড়ে যাবে তখন আবার আমি অন্য চামড়া দিয়ে তা পাল্টে দেবো। যাতে তারা 'আযাব ভোগ করতে পারে।"[৫]

এই শাস্তি যেন তারা চিরকাল ভোগ করতে পারে তাই সেখানে তাদের কারো মৃত্যু হবে না। তারা আর্তনাদ করতে থাকবে। ইরশাদ হয়েছে– 'তবে যারা কুফরি করে তাদের জন্য জাহান্নামের শাস্তি রয়েছে।' তাদের মৃত্যুর আদেশ দেওয়া হবে না এবং শাস্তিও হালকা করা হবে না, এভাবে আমি অকৃতজ্ঞদের শাস্তি দিয়ে থাকি। তারা সেখানে আর্তনাদ করে বলবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের বের করুন, আমরা ভালো কাজ করব, আগে যা করেছি তা করব না'। আল্লাহ তা'আলা বলবেন, 'আমি কি তোমাদের এত দীর্ঘ জীবন দিইনি? তখন কেউ সতর্ক হতে চাইলে সতর্ক হতে পারত। অতএব তোমরা শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করো, জালিমদের কোনো সাহায্যকারী নেই।'[৬] আমরা সদা-সর্বদা এই জাহান্নাম ও তার শাস্তি থেকে বাঁচার চেষ্টা করব। সাথে সাথে আমরা আমাদের পরিবার-পরিজনকেও বাঁচানোর চেষ্টা করব। পরিবার পরিজন, সন্তান-সন্ততিকে জাহান্নাম থেকে বাঁচানোর উপায় হলো, তাদের ইসলামী শিক্ষা দেওয়া, তাদের অন্তরে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ﷺ)-এর আনুগত্যের মানসিকতা গড়ে তোলা, শিশুকার থেকেই মহান আল্লাহর আদেশ নিষেধ মানার ওপর অভ্যস্ত করা, কখনো প্রয়োজন হলে শরিয়তসম্মত উপায়ে শাসনের প্রয়োগ করে হলেও মহান আল্লাহর আদেশ নিষেধ মেনে চলতে বাধ্য করা।

স্ত্রী সন্তান-সন্ততির শিক্ষাদীক্ষার ব্যবস্থা করা: ফিকাহবিদগণ বলেন, স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিকে ফরয কর্মসমূহ এবং হালাল ও হারামের বিধানাবলী শিক্ষা দেওয়া এবং তা পালন করানোর চেষ্টা করা প্রত্যেক ব্যক্তির উপর আবশ্যিক। একথা আলোচ্য আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়েছে। এক হাদীসে এসেছে–

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, আল্লাহ ঐ ব্যক্তিকে রহমত করুন, যে নিজে রাতে সালাত আদায় করতে দাঁড়িয়েছে এবং তার স্ত্রীকে জাগিয়েছে, সে যদি দাঁড়াতে অস্বীকার করে তার মুখে পানি ছিটিয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ঐ মহিলাকেও রহমত করুন যে, নিজে রাতে সালাত আদায় করতে দাঁড়িয়েছে এবং তার স্বামীকে জাগিয়েছে, যদি সে দাঁড়াতে অস্বীকার করে তার মুখে পানি ছিটিয়েছে।[৭]

হাদীসে আরও এসেছে–

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে সালাতের জন্য সাত বছর বয়সে পৌঁছলেই নির্দেশ দাও, আর তাদেরকে দশ বছর হলে এর জন্য প্রহার করো। আর তাদের শোয়ার জায়গা পৃথক করে দাও।[৮]

---

[২] *তাফসীরে রূহুল মা'আনী।*
[৩] *সহীহুল বুখারী- হা. ৩২৬৫।*
[৪] *সূরা আল হুমাযাহ: ৬-৭।*
[৫] *সূরা আন্ নিসা: ৫৬।*
[৬] *সূরা ফা-ত্বির: ৩৬-৩৭।*
[৭] *আবূ দাউদ- হা. ১৪৫০; সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ১৩৩৬।*
[৮] *সুনান আবূ দাউদ- হা. ৪৯৫; মুসনাদ আহমাদ- ২/১৮০।*

৬৬ বর্ষ ॥ ০১-০২ সংখ্যা ❖ ০৭ অক্টোবর- ২০২৪ ঈ. ❖ ০৩ রবিউস্ সানি- ১৪৪৬ হি.

অনুরূপভাবে পরিবার-পরিজনকে সালাতের সময়, সাওমের সময় হলে স্মরণ করিয়ে দেয়াও এর অন্তর্ভুক্ত। রাসূল (ﷺ) যখনই বিত্‌র পড়তেন তখনি 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-কে ডাকতেন এবং বলতেন, "হে 'আয়িশাহ্! দাঁড়াও এবং বিত্‌র আদায় করো।"[৯]

وَّقُوۡدُهَا النَّاسُ وَالۡحِجَارَةُ-এর তাফসীর: ইরশাদ হচ্ছে–

﴿وَّقُوۡدُهَا النَّاسُ وَالۡحِجَارَةُ﴾

অর্থাৎ- "যার ইন্ধন (জালানী) হবে মানুষ ও পাথর।"

মানুষকে তাদের অপরাধের কারণে জাহান্নামের ইন্ধন বানিয়ে শাস্তি দেওয়া হবে। কিন্তু পাথরকে জাহান্নামের ইন্ধন বানানো হবে কেন? মুফাস্‌সিরগণ বলেন এখানে الۡحِجَارَةُ (পাথর) দ্বারা উদ্দেশ্য– পাথর দ্বারা নির্মিত প্রতিমা, মূর্তিপূজকরা যাদের পূজা করে থাকে। তাদেরকে জাহান্নামে ফেলে তাদের পূজারীদের শিক্ষা দেওয়া হবে যে, দেখো তোমরা যাদেরকে উপাস্য মনে করতে আজ তাদেরও কী শোচনীয় পরিণাম হয়েছে।

عَلَيۡهَا مَلٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ-এর তাফসীর: ইরশাদ হচ্ছে–

﴿عَلَيۡهَا مَلٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ﴾

অর্থাৎ- "তাতে নিয়োজিত আছে কঠোর স্বভাব, কঠিন হৃদয় ফেরেশ্‌তাগণ!"

মহান আল্লাহর ফেরেশ্‌তাদের মধ্য হতে এমন একদল ফেরেশ্‌তাকে এই আগুনের উপর নিয়োজিত করা হয়েছে যাদের কাছে জাহান্নামীদের জন্য কোনো দয়া নেই, তাদের উপর এসকল ফেরেশ্‌তারা কোনো মায়া-মমতা নেই। সর্বদায়ই তাদের উপর এরা কঠোর হয়ে থাকে।

لَّا يَعۡصُوۡنَ اللّٰهَ مَاۤ اَمَرَهُمۡ وَيَفۡعَلُوۡنَ مَا يُؤۡمَرُوۡنَ এর তাফসীর: ইরশাদ হচ্ছে–

﴿لَّا يَعۡصُوۡنَ اللّٰهَ مَاۤ اَمَرَهُمۡ وَيَفۡعَلُوۡنَ مَا يُؤۡمَرُوۡنَ﴾

অর্থাৎ- "যারা আল্লাহর কোনো হুকুমে তার অবাধ্যতা করে না এবং সেটাই করে, যার নির্দেশ তাদেরকে দেওয়া হয়।"

এই ফেরেশ্‌তাদের একটি বৈশিষ্ট্য হলো– তারা মহান আল্লাহর কোনো নির্দেশই অমান্য করে না এবং তাদেরকে যা নির্দেশ করা হয় তারা তাই করে থাকে।

জাহান্নাম থেকে বাঁচতে পারাই জীবনের প্রকৃত সফলতা: সকল পিতা-মাতাই তাদের সন্তানের সফলতা কামনা করেন। তাই তারা তাদের সন্তানদেরকে শিক্ষাদানের জন্য স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠিয়ে থাকেন। ক্লাসের পর প্রাইভেট, কোচিং কোনোকিছুরই ঘাটতি রাখেন না। সন্তানকে দুনিয়ার জীবনে সফল করতে যেই পিতা-মাতার এত চেষ্টা-তদবীর, সেই পিতা-মাতারা কি কখনো চিন্তা করে দেখেছেন? মৃত্যুর পর আপনার সেই সন্তান জাহান্নামের দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকা আগুন থেকে বাঁচতে পারবে কি? তা থেকে যদি বাঁচতে না-ই পারে তাহলে কিসের সফলতা? আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা বলেন–

﴿كُلُّ نَفۡسٍ ذَآئِقَةُ الۡمَوۡتِ ؕ وَاِنَّمَا تُوَفَّوۡنَ اُجُوۡرَكُمۡ يَوۡمَ الۡقِيٰمَةِ ؕ فَمَنۡ زُحۡزِحَ عَنِ النَّارِ وَ اُدۡخِلَ الۡجَنَّةَ فَقَدۡ فَازَ ؕ وَمَا الۡحَيٰوةُ الدُّنۡيَاۤ اِلَّا مَتَاعُ الۡغُرُوۡرِ﴾

অর্থ- "প্রতিটি প্রাণী মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। আর অবশ্যই কিয়ামতের দিনে তাদের প্রতিদান পরিপূর্ণভাবে দেওয়া হবে। সুতরাং যাকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে সে-ই সফলতা পাবে। আর দুনিয়ার জীবন শুধু ধোঁকার সামগ্রী।"[১০]

জাহান্নামের এ আগুন থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহ সুবহা-নাহু তা'আলা দু'আও শিক্ষা দিয়েছেন–

﴿اِنَّهَا سَآءَتۡ مُسۡتَقَرًّا وَّمُقَامًا رَبَّنَا اصۡرِفۡ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ ٭ۖ اِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا﴾

অর্থ- "হে আমার পালনকর্তা! আমাদের কাছ থেকে জাহান্নামের শাস্তি হটিয়ে দিন। নিশ্চয় এর শাস্তি নিশ্চিত ধ্বংস। বসবাস ও অবস্থানস্থল হিসেবে তা কত নিকৃষ্ট জায়গা!"[১১]

শিক্ষাসমূহ

এক. জাহান্নামের শাস্তি ও এর ভয়াবহতা সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞান অর্জন করা।

দুই. জাহান্নামের শাস্তির কাজে নিয়োজিত ফেরেশ্‌তাদের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধারণা লাভ।

তিন. জাহান্নাম থেকে বাঁচার জন্য সর্বান্তকরণে চেষ্টা করা।

চার. পরিবার-পরিজনকে জাহান্নাম থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করা।

পাঁচ. প্রকৃত সফলতার পরিচয় লাভ। ☒

[৯] *সহীহ মুসলিম- হা. ৭৪৪; মুসনাদ আহমাদ- ৬/১৫২।*

[১০] *সূরা আ-লি 'ইমরান: ১৮৫।*

[১১] *সূরা আল ফুরক্বা-ন: ৬৫-৬৬।*

হাদীসে রাসূল ﷺ

সমকামীদের প্রতি মহান আল্লাহর লানত

–গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক★

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর অমিয় বাণী

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضي الله عنه): أَنَّ النَّبِيَّ (ﷺ) قَالَ لَعَنَ اللهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ، ثَلَاثًا.

সরল বাংলা অনুবাদ

‘আব্দুল্লাহ ইবনু ‘আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, যে ব্যক্তি লূতের সম্প্রদায়ের কাজে (সমকামে) লিপ্ত হবে তার প্রতি মহান আল্লাহর অভিসম্পাত। এ কথা তিনি তিনবার বলেছেন।[১২]

হাদীসের ব্যাখ্যা

ইসলামে সমকামিতা (Homosexuality) তথা পুরুষের সাথে পুরুষ অথবা নারীর সাথে নারীর যৌনকর্মে লিপ্ত হওয়া কঠোরভাবে নিষিদ্ধ, কবীরা গুনাহ ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এটি যিনার থেকেও নিকৃষ্ট। কেননা তা প্রকৃতি বিরুদ্ধ যৌনাচার এবং মানবতা বিধ্বংসী আচরণ। মানবজাতির পরিবার গঠনের স্বাভাবিক নিয়ম হলো, একজন পুরুষ একজন নারীকে বৈধভাবে বিয়ে করার পর তারা দাম্পত্য জীবন গঠন করবে। অতঃপর স্বামী-স্ত্রী মধুর মিলনে স্ত্রী গর্ভধারণ করবে ও সন্তান জন্ম দিবে। অতঃপর বাবা-মা সন্তানের পরিপালনের দায়িত্বভার কাঁধে তুলে নিবেন। এই তো একটি সুন্দর মানবজীবন। এভাবে মানব সন্তানের বংশ বিস্তার ঘটবে এবং ফুলে-ফলে সুশোভিত হবে এই সুন্দর বসুন্ধরা। কিন্তু সমকামিতা হলো, প্রকৃতি বিরুদ্ধ ও ধ্বংসাত্মক কাজ এবং মানবজাতির বংশ বিস্তারের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক। সমকামিতা যেনার চেয়েও মারাত্মক একটি কবীরা গুনাহ। এ কাজে যারা জড়িত তারা সবাই অভিশপ্ত। হাদীসে এসেছে–

عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِيْ عَمْرٍو (رضي الله عنه) قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ): «مَلْعُوْنٌ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ».

‘আম্র ইবনু আবূ ‘আম্র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, “যে ক্বওমে লূতের কাজ (সমকামিতা) করেছে, সে অভিশপ্ত।”[১৩]

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) "إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِيْ عَمَلُ قَوْمِ لُوْط".

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, আমি আমার উম্মাতের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি আশংকা যে ব্যাপারটির করি সেটি হলো লূত সম্প্রদায়ের কর্ম।[১৪]

عَنِ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) مَلْعُوْنٌ مَنْ أَتَى امْرَأَةً فِيْ دُبُرِهَا.

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) বলেছেন, “যে কোনো স্ত্রীর পায়ুপথে যৌনকর্ম করেছে, সে অভিশপ্ত।”[১৫]

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضي الله عنه)، قال : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ): «لعن الله من والى غير موالیه لَعَنَ اللهُ مَنْ غَيَّرَ تُخُوْمَ الْأَرْضِ لَعَنَ اللهُ مَنْ كَمَّهَ أَعْمَى عَنْ الطَّرِيْقِ وَلَعَنَ اللهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ ذبح لغير الله ولعن الله من وقع على بهيمة وَلَعَنَ اللهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوْطٍ وَلَعَنَ اللهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوْطٍ وَلَعَنَ اللهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوْطٍ».

‘আব্দুল্লাহ ইবনু ‘আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, “যে তার নিজের অভিভাবককে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করলো, আল্লাহ তা‘আলা তাকে অভিশপ্ত করুন। আর যে জমিনের কোনো নিদর্শন (পাহাড়/টিলা ও নদী/খাল ইত্যাদি) নষ্ট করলো, তাকেও আল্লাহ তা‘আলা অভিশপ্ত করুন। আর যে কোনো অন্ধকে পথ দেখালো না, তাকেও আল্লাহ তা‘আলা অভিশপ্ত করুন। আর যে তার পিতা-মাতাকে অভিশাপ দিলো, তাকেও আল্লাহ তা‘আরা অভিশপ্ত করুন। আর যে কোনো পশুর সঙ্গে সঙ্গম করলো, তাকেও আল্লাহ তা‘আলা অভিশপ্ত করুন। আর যে লূত সম্প্রদায়ের কাজ (সমকামিতা) করলো, তাকেও আল্লাহ তা‘আলা অভিশপ্ত করুন (শেষের এ বাক্যটি তিনি তিনবার উচ্চারণ করেছেন)।”[১৬]

★ *প্রভাষক (আরবী), মহিমাগঞ্জ আলিয়া কামিল মাদ্‌রাসা, গাইবান্ধা।*

[১২] *মুসনাদ আহমাদ- হা. ২৯১৫, শাইখ শু‘আইব আরনাবুত হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।*

[১৩] *সুনান আত্ তিরমিযী- হা. ১৪৫৬, সহীহ।*

[১৪] *সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ২৫৬৩; জামে‘ আত্ তিরমিযী- হা. ১৪৫৭, হুসাইন আল-মাদানী প্রকাশনী।*

[১৫] *আবূ দাউদ- হা. ২১৬২ ও মুসনাদ আহমাদ- হা. ৯৭৩১।*

[১৬] *মুসনাদ আহমাদ- হা. ৮৫৫; সুনান কুবরা- বাইহাক্বী, হা. ১৬৭৯৪; মুস্তাদরাকে হাকিম- হা. ৮০৫২।*

সমকামিতার পরিচয়: বাংলা সমকামিতা শব্দটির গঠন সংস্কৃত হতে। সংস্কৃত শব্দ 'সম'-এর অর্থ সমান অথবা অনুরূপ এবং 'কাম' শব্দের অর্থ যৌন চাহিদা, রতিক্রিয়া তথা যৌন তৃপ্তি। অতঃপর এই দুই শব্দের সংযোগে উৎপন্ন সমকামিতা শব্দ দ্বারা অনুরূপ, সমান বা একই লিঙ্গের মানুষের প্রতি যৌন আকর্ষণকে বুঝায়। সমকামিতার ইংরেজি প্রতিশব্দ Homosexuality (হোমোসেক্সুয়ালিটি) তৈরি হয়েছে গ্রিক 'হোমো' এবং ল্যাটিন 'সেক্সাস' শব্দের সমন্বয়ে। গ্রিক ভাষায় 'হোমো' বলতে বুঝায় সমধর্মী বা একই ধরনের। আর 'সেক্সাস' শব্দটির অর্থ হচ্ছে যৌনতা। পারিভাষিক অর্থে- সমকামিতা (Homosexuality) সমপ্রেম বলতে সমলিঙ্গের ব্যক্তির প্রতি রোমান্টিক আকর্ষণ, যৌন আকর্ষণ অথবা যৌন আচরণকে বুঝায়।

সমকামিতার সূচনা: পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বপ্রথম সমকামিতায় লিপ্ত হয় লূত (আলাইহিস সালাম)-এর জাতি। আল্লাহ বলেন,

﴿أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ رَبِّ انْصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ﴾

"তোমরাই তো পুরুষে উপগত হচ্ছ, তোমরাই তো রাহাজানি করে থাকো এবং তোমরাই তো নিজেদের মজলিসে প্রকাশ্যে ঘৃণ্য কর্ম করে থাকো। উত্তরে তার সম্প্রদায় শুধু এ বলল, 'আমাদের উপর আল্লাহর শাস্তি আনায়ন করো যদি তুমি সত্যবাদী হও।' সে বলল, 'হে আমার প্রতিপালক! বিপর্যয় সৃষ্টিকারী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য করো'।"[১৭] লূত (আলাইহিস সালাম)-এর জাতির শাস্তি সম্পর্কে কুরআনে বর্ণিত হয়েছে,

"অতঃপর যখন আমার আদেশ আসলো তখন আমি জনপদকে উল্টিয়ে দিলাম এবং তাদের উপর ক্রমাগত বর্ষণ করলাম প্রস্তর কঙ্কর, যা তোমার প্রতিপালকের নিকট চিহ্নিত ছিল। এটা যালিমদের হতে দূরে নয়।"[১৮] আল্লাহ আরও বলেন:

﴿وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ ○ أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ○ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ○ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ ○ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ﴾

"স্মরণ করো লূতের কথা, যখন সে তার সম্প্রদায়কে বলেছিল, 'তোমরা জেনে-শুনে কেন অশ্লীল কাজ করছো, 'তোমরা কি কামতৃপ্তির জন্য নারীকে ছেড়ে পুরুষে উপগত হবে? তোমরা তো এক অজ্ঞ সম্প্রদায়।' উত্তরে তার সম্প্রদায় শুধু বলল, 'লূত-পরিবারকে তোমাদের জনপদ হতে বহিষ্কৃত করো, এরা তো এমন লোক যারা পবিত্র সাজতে চায়।' অতঃপর আমি তাকে ও তার পরিবারবর্গকে উদ্ধার করলাম, তার স্ত্রী ব্যতীত, তাকে করেছিলাম ধ্বংসপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত। তাদের উপর ভয়ংকর বৃষ্টি বর্ষণ করেছিলাম, ভীতি প্রদর্শিতদের জন্য এ বর্ষণ ছিল কত নিকৃষ্ট।"[১৯]

ইসলাম সমকামিতার পথ বন্ধ করেছে যেভাবে: ইসলাম সমকামিতার পথ বন্ধ করার উদ্দেশ্যে যে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে তা হলো–

عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) قَالَ لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِيْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِيْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ.

আবূ সা'ঈদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূল (ﷺ) বলেছেন, এক পুরুষ অপর পুরুষের লজ্জাস্থানের প্রতি তাকাবে না। তেমনি এক নারী অপর নারীর লজ্জাস্থানের প্রতি তাকাবে না। দু'জন পুরুষ একটি কাপড়ের নীচে শয্যা গ্রহণ করবে না। তেমনি দু'জন নারী একটি কাপড়ের নীচে শয্যা গ্রহণ করবে না।[২০] অন্য হাদীসে বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) لَا تُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فَتَنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا.

ইবনু মাস'ঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূল (ﷺ) বলেছেন, এক নারী অপর নারীর চামড়ার সাথে চামড়া লাগাবে না। কারণ সে তার স্বামীকে ঐ নারীর অঙ্গের বিবরণ দিতে পারে তখন তার স্বামী ঐ নারীকে যেন অন্তরের চোখে দেখবে।[২১]

সমকামিতার ভয়াবহ শাস্তি: সমকামিতার শাস্তি হত্যা। কওমে লূতের উপর পাথর বৃষ্টি বর্ষণ ও তাদের আবাসকে ধ্বংস পূর্বক মহান প্রভূ তাদেরকে হত্যা করা থেকে প্রমাণিত হয়, সমকামিতার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। আমাদের নবী (ﷺ)-ও বিভিন্ন হাদীসে এ কাজের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড বলে উল্লেখ করেছেন।

---

[১৭] *সূরা আল 'আনকাবূত: ২৯-৩০।*

[১৮] *সূরা হূদ: ৮২-৮৩।*

[১৯] *সূরা আন্ নাম্‌ল: ৫৪-৫৮।*

[২০] *সহীহ মুসলিম; মিশকা-তুল মাসা-বীহ- হা. ৩১০০; বাংলা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, অধ্যায়- 'বিবাহ', হা. ২৯৬৬।*

[২১] *সহীহুল বুখারী; সহীহ মুসলিম; মিশকা-তুল মাসা-বীহ- হা. ৪০৯৯, বাংলা, ৮ম খণ্ড, অধ্যায়- 'শিষ্টাচার', হা. ৩৯২১।*

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضي الله عنه) قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ): مَنْ وَجَدْتُمُوْهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوْطٍ فَاقْتُلُوْا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُوْلَ بِهِ.

'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, যাদেরকে তোমরা লূতের সম্প্রদায়ের কাজে (সমকামে) লিপ্ত দেখবে তাদের উভয়কেই হত্যা করো।[২২]

'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, يُنْظَرُ أَعْلَى بِنَاءٍ فِي الْقَرْيَةِ، فَيُرْمَى اللُّوْطِيُّ مِنْهَا مُنَكَّساً، ثُمَّ يُتْبَعُ بِالْحِجَارَةِ.

"সমকামীকে মহল্লার সর্বোচ্চ প্রাসাদের ছাদ থেকে উপুড় করে নিক্ষেপ করা হবে। অতঃপর তার উপর পাথর মারা হবে।"[২৩] সমকামীর জন্য পরকালের শাস্তি হচ্ছে আল্লাহ তার প্রতি রহমতের দৃষ্টিতে কখনো তাকাবেন না। 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ﷺ) বলেন, لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَى رَجُلٍ أَتَى رَجُلًا أَوِ امْرَأَةً فِي الدُّبُرِ.

"আল্লাহ এমন ব্যক্তির প্রতি রহমতের দৃষ্টিতে কখনো তাকাবেন না যে সমকামে লিপ্ত হয় অথবা কোনো মহিলার মলদ্বারে গমন করে।"[২৪] মুহাম্মাদ ইবনু মুনকাদির (রাহিমাহুল্লা-হ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

"খালিদ ইবনু ওয়ালীদ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) একদা আবূ বক্র (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)-এর নিকট এ মর্মে একটি চিঠি পাঠালেন যে, তিনি আরবের কোনো এক মহল্লায় এমন এক ব্যক্তিকে পেয়েছেন যাকে দিয়ে যৌন উত্তেজনা নিবারণ করা হয় যেমনিভাবে নিবারণ করা হয় মহিলা দিয়ে। তখন আবূ বক্র (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) সকল সাহাবীগণকে একত্রিত করে এ ব্যাপারে তাদের পরামর্শ চেয়েছেন। তাদের মধ্যে 'আলী (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) তখন উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন, এটি এমন একটি গুনাহ যা বিশ্বে শুধুমাত্র একটি উম্মতই এটি করেছে। আল্লাহ তা'আলা ওদের সঙ্গে যে ব্যবহার করেছেন তা সম্পর্কে আপনারা অবশ্যই অবগত। অতএব আমার মত হচ্ছে, তাকে আগুনে জ্বালিয়ে দেওয়া হবে। উপস্থিত সকল সাহাবারাও উক্ত মতের সমর্থন করেন। তখন আবূ বক্র (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) তাকে আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেওয়ার ফরমান জারি করেন।

ইমাম আত্ তিরমিযী (রাহিমাহুল্লা-হ) বলেন, আহলুল ইল্ম বা অভিজ্ঞ আলেমদের মধ্যে সমকামীর হাদ্দ বা শাস্তির ব্যাপারে মতপার্থক্য রয়েছে।

[২২] *আত্ তিরমিযী- ৪/৫৭; আবূ দাউদ- ৪/২৬৯; ইবনু মাজাহ- ২/৮৫৬; শাইখ আলবানি হাদীসটিকে সহিহ বলেছেন।*

[২৩] *ইবন আবী শাইবাহ, হা. ২৮৩২৮; বায়হাক্বী- ৮/২৩২।*

[২৪] *আবী শাইবাহ- হা. ১৬৮০৩; আত্ তিরমিযী- হা. ১১৬৫।*

কিছু বিশেষজ্ঞ মনে করেন, উভয় সমকামীকেই রজম (অর্থাৎ- পাথর মেরে হত্যা) করতে হবে; চাই সে বিবাহিত হোক অথবা অবিবাহিত হোক। এই মতের পক্ষে রয়েছেন ইমাম মালিক, ইমাম শাফি'য়ী, ইমাম আহমাদ ও ইসহাক্ব। পক্ষান্তরে তাবিঈদের মধ্য হতে হাসান আল-বাসরী, ইব্রাহীম নাখঈ, 'আত্বা ইবনু আবূ রাবাহ-সহ অন্যান্য বিদ্বানগণ বলেছেন, সমকামীর শাস্তি ব্যভিচারীর শাস্তির মতোই। একই মত পোষণ করেছেন সুফিয়ান সাওরী ও কুফাবাসীরা।[২৫]

ইমাম ইবনুল ক্বাইয়্যিম (রাহিমাহুল্লা-হ) ও আল্লামাহ শানক্বিত্বী (রাহিমাহুল্লা-হ) বলেন, আমাদের উস্তাদগণ বলেছেন, 'সমকামীদের হত্যার ব্যাপারে সাহাবীগণ ঐক্যমত পোষণ করেছেন। তাঁরা শুধুমাত্র হত্যার পদ্ধতিগত বিষয় নিয়ে মতপার্থক্য করেছেন'।[২৬]

সমকামীদের বিষয়ে ইমাম মালিক (রাহিমাহুল্লা-হ) অত্যাধিক কঠোর ছিলেন। তিনি সমকামীকে রজম (অর্থাৎ- পাথর মেরে হত্যা) করা অপরিহার্য করেছিলেন, চায় সে বিবাহিত হোক অথবা অবিবাহিত হোক। আর এ বিষয়ে এটিই সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য মত।[২৭]

ইবনু আবিদীন (রাহিমাহুল্লা-হ) বলেন, 'ব্যভিচারীর মতো সমকামীদের উপরেও হাদ্দ (শাস্তি) প্রয়োগ করা অপরিহার্য। তাদের উপর হাদ্দ অপরিহার্য হওয়ার ব্যাপারে সাহাবীগণ ঐক্যমত পোষণ করেছেন। তবে কেউ কেউ মতপার্থক্যও করেছেন, যেমন- আবূ বক্র সিদ্দিক (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করার কথা বলেছেন।'[২৮]

শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ (রাহিমাহুল্লা-হ) বলেন, 'উভয় সমকামীকেই হত্যা করার ব্যাপারে সাহাবীগণ ঐক্যমত পোষণ করেছেন। তাঁদের মধ্যে কিছু সংখ্যক সাহাবী বলেছেন, পাথর মেরে হত্যা করতে হবে। আবার কিছু সংখ্যক সাহাবী বলেছেন, সমকামীকে মহল্লার সর্বোচ্চ প্রাসাদের ছাদ থেকে উপুড় করে নিক্ষেপ করতে হবে। অতঃপর তার উপর পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করতে হবে। পক্ষান্তরে কিছু সংখ্যক সাহাবী বলেছেন, তাদেরকে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করতে হবে। তবে জমহূর সালাফ ও ফিকহবিদদের মতানুযায়ী উভয় সমকামীকেই রজম করতে হবে, চাই সে বিবাহিত হোক অথবা অবিবাহিত হোক।'[২৯]

সিহাক বা নারী সমকামীদের বিধান: সিহাক বলতে বুঝায় নারীতে নারীতে একে অপরের শরীরে ঘষাঘষি করা।

[২৫] *জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ১৪৫৬।*

[২৬] *যাদুল মা'আদ- ৫ম খণ্ড, পৃ. ৪০; আজওয়াউল বায়ান- ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৫।*

[২৭] *ইগাসাতুল লাহ্ফান- ২য় খণ্ড, পৃ. ১৪৪।*

[২৮] *হাশিয়াতু ইবনু আবিদীন- ৪/৯১; আদ-দুর্রুল মুখতার- ৪/২৭।*

[২৯] *মাজমূউল ফাতাওয়া ইবনু তাইমিয়্যাহ- ১১/৫৪৩ পৃ.; যাদুল মা'আদ- ৫/৪০ পৃ.; আযওয়াউল বায়ান- ৩/৩৫ পৃ.।*

নিঃসন্দেহে এটি হারাম কাজ। অসংখ্য আলেম একে কাবীরা গুনাহ বলেছেন।[৩০]

সৌদী আরবের স্থায়ী ফাতাওয়া কমিটি ও শায়খ সালিহ আল-মুনাজ্জিদ বলেন, সিহাক বা নারীতে নারীতে সমকামিতা করা হারাম। এটি কবীরা গুনাহসমূহের মধ্যে অন্যতম। কেননা এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করা হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ ○ اِلَّا عَلٰٓى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ ○ فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَآءَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ﴾

"আর যারা নিজেদের যৌনাঙ্গকে সংরক্ষিত ও সংযত রাখে। নিজেদের স্ত্রী অথবা অধিকারভুক্ত দাসীগণ ব্যতীত, এতে তারা নিন্দনীয় হবে না। সুতরাং কেউ এদেরকে ছাড়া অন্যকে কামনা করলে তারাই হবে সীমালংঘনকারী।"[৩১]

উপর্যুক্ত আয়াত থেকে এ কথাও প্রতিভাত হয় যে, হস্তমৈথুন করাও হারাম। কেননা এর মধ্যে বিবিধ অকল্যাণ রয়েছে।[৩২]

পুরুষ সমকামিতার ক্ষেত্রে যেমন হাদ্দ (নির্ধারিত শাস্তি) অপরিহার্য, ঠিক তেমনি নারী সমকামিতার ক্ষেত্রেও তা'যীর (التعزير) অপরিহার্য। তা'যীর বলতে বুঝায়, বিচারকের বিবেচনায় শিক্ষামূলক শাস্তি দান করা, যা বিচারক দোষ ও দোষীর অবস্থা এবং গভীরতা বুঝে নির্ধারণ করবেন।[৩৩]

ইবনুল হুমাম আল-হানাফী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'যদি একজন মহিলা অপরজন মহিলার সঙ্গে সমকামিতায় লিপ্ত হয়, সেক্ষেত্রে তাদের উপর তা'যীর কার্যকরী হবে'।[৩৪]

ইবনু আব্দিল বার্র (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'যদি দু'জন নারীর ব্যাপারে সমকামিতা প্রমাণিত হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে তাদের জন্য কঠিনতম এবং ভয়ঙ্কর শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে'।[৩৫]

ইমাম ইবনু কুদামাহ্ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'যদি দু'জন নারী শরীরে শরীরে ঘষাঘষি করে, তাহলে তারা দু'জনেই অভিশপ্ত ব্যভিচারিণী। কেননা রাসূল (ﷺ) বলেছেন, যদি একজন মহিলা অপর একজন মহিলার সঙ্গে নির্জনে গমন করে, তবে তারা দু'জনেই ব্যভিচারিণী। তবে তাদের উপর হাদ্দ কার্যকারী হবে না। কারণ তারা সঙ্গম করতে সক্ষম নয়; বরং তাদের উপর তা'যীর কার্যকারী করা হবে।'[৩৬]

প্রচলিত আইনে সমকামিতার শাস্তিঃ অধিকাংশ সমাজে এবং সরকার ব্যবস্থায় সমকামী আচরণকে দণ্ডনীয় অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়। উদাহরণস্বরূপ বাংলাদেশ (দশ বছরের থেকে শুরু করে আমরণ সশ্রম কারাদণ্ড)-সহ দক্ষিণ এশিয়ার ৬টি দেশের সংবিধানে ৩৭৭ ধারা এবং ১৯টি দেশে সমপর্যায়ের ধারা এবং সম্পূরক ধারা মোতাবেক সমকামিতা ও পশুকামিতা প্রকৃতি বিরোধী যৌনাচার হিসেবে শাস্তিযোগ্য ও দণ্ডনীয় ফৌজদারি অপরাধ।

বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ৩৭৭ ধারা মোতাবেক পায়ু মৈথুন শাস্তিযোগ্য ফৌজদারি অপরাধ, যার শাস্তি দশ বছর থেকে শুরু করে আজীবন কারাদণ্ড এবং সাথে জরিমানাও হতে পারে। এ আইনে বলা হয়েছে–

৩৭৭. প্রকৃতিবিরুদ্ধ অপরাধঃ কোনো ব্যক্তি যদি স্বেচ্ছায় কোনো পুরুষ, নারী বা পশু প্রকৃতির নিয়মের বিরুদ্ধে যৌন সঙ্গম করে, তবে তাকে আজীবন কারাদণ্ড দেওয়া হবে, অথবা বর্ণনা অনুযায়ী নির্দিষ্ট কালের কারাদণ্ড প্রদান করা হবে যা দশ বছর পর্যন্ত বর্ধিত হতে পারে এবং এর সাথে নির্দিষ্ট অঙ্কের আর্থিক জরিমানাও দিতে হবে।

ব্যাখ্যাঃ ধারা অনুযায়ী অপরাধ প্রমাণে যৌনসংগমের প্রয়োজনীয় প্রমাণ হিসেবে লিঙ্গ প্রবেশের প্রমাণ যথেষ্ট হবে। ৩৭৭ ধারার ব্যাখ্যায় পায়ু সঙ্গম জনিত যে কোনো যৌথ যৌন কার্যকলাপকে এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ কারণে, পরস্পর সম্মতিক্রমে বিপরীতকামী মুখকাম ও পায়ু মৈথুনও উক্ত আইন অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে গণ্য হতে পারে।[৩৭]

উপসংহার

পরিশেষে বলতে চাই, নিজেকে হিফাযতে রাখার জন্য আপনি অনতিবিলম্বে শরিয়তসিদ্ধ পথ গ্রহণ করুন। সেটা হচ্ছে– বিবাহ। বিবাহের মাধ্যমে আপনি পুনরায় এ জাতীয় হারামে লিপ্ত হওয়া থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারবেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ منكُم الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ.

হে যুব সমাজ! তোমাদের মধ্যে যারা সামর্থ্য রাখো তাদের উচিত বিয়ে করে ফেলা। কেননা বিয়ে দৃষ্টি অবনতকারী ও লজ্জাস্থানকে হিফাযতকারী। আর যার সামর্থ্য নেই তার উচিত রোযা রাখা। কেননা রোযা যৌন উত্তেজনা প্রশমনকারী।'[৩৮] ☒

---

[৩০] *আয্ যাওয়াজির 'আন ইকতিরাফিল কাবাইর- কাবীরাহ, পৃ. ৩৬২।*

[৩১] *সূরা আল মু'মিনূন: ৫-৭।*

[৩২] *ফাতাওয়া আল-লাজনাতুদ দায়িমাহ- ২২তম খণ্ড, পৃ. ৬৮; ইসলাম সাওয়াল জাওয়াব- ফাতাওয়া নং- ২১০৫৮।*

[৩৩] *আল-মুফাসসাল ফী আহকামিল মারা'আতি- ৫ম খণ্ড, পৃ. ৪৫০।*

[৩৪] *ফাতহুল কাদীর- ৫ম খণ্ড, পৃ. ২৬২; আসনাল মাত্বালীব- ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১২৬।*

[৩৫] *আল-কাফী ফী ফিকহি আহলিল মাদীনাহ্- ২য় খণ্ড, পৃ. ১০৭৩।*

[৩৬] *আল-মুগনী- ৯/৫৯ পৃ., ১০/১৬২ পৃ.; তুহফাতুল মুহতাজ- ৯/১০৫ পৃ.।*

[৩৭] *মুক্ত বিশ্বকোষ- বাংলাদেশে সমকামীদের অধিকার।*

[৩৮] *সহীহুল বুখারী- হা. ৫০৬৬।*

প্রবন্ধ

বাংলাদেশে অলিগার্কতন্ত্রঃ উটপাখি ও কুমিরের বুকের চামড়ার জুতা

–আবূ সা'দ ড. মো. ওসমান গনী*

সম্প্রতি বাংলাদেশে অলিগার্কতন্ত্র শব্দটি পত্র-পত্রিকায় ছেয়ে গেছে। আমার ধারণা বছর পনের আগেও শব্দটি অভিধানেই ছিল। চর্চা তেমন ছিল না। হ্যাঁ, ছিল, কিন্তু ভিন দেশে। রাশিয়ায়। সোভিয়েত ইউনিয়ন ভাঙ্গার প্রক্রিয়াকালে ও পরে নব্বইয়ের দশক থেকে অলিগার্কদের উত্থান ঘটে। মিখাইল গর্বাচেভের উত্তরাধিকারী হন প্রেসিডেন্ট বরিস ইয়েলেৎসিন। কম্যুনিস্ট শাসনের অবসানে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের প্রবর্তনে শাসনতান্ত্রিক নৈরাজ্য দেখা দেয়। দ্রব্যমূল্যের লাগামহীনতা, আকাশচুম্বী মুদ্রাস্ফীতি, রুবেলের ভূমি ধস দরপতন, নাগরিক সমাজের অকার্যকর ভূমিকা এবং সাধারণ মানুষের মাঝে চরম অনিশ্চয়তা অস্থিরতা ও সমাজের বৈষম্য-অনায্যতার সুযোগে গড়ে উঠে অলিগার্ক শ্রেণির আধিপত্য। রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট বরিস ইয়েলেৎসিনের শাসন কাঠামোর অবিচ্ছেদ্য অংশীদার হয়ে যান অলিগার্করা।

শাসন ও শোষণের মধ্যখানে বিরাজিত এ শ্রেণিটির নামকরণের শানেনযুল বড়ই চমকপ্রদ। প্রাচীন গ্রিক শব্দ 'Oligol' (few) ও 'Arkhein' (to rule) থেকে আলগার্ক শব্দটির উৎপত্তি। দুর্নীতি সাধনে চরম ও ক্ষমতা চর্চায় বিশেষ সুবিধা প্রাপ্তির বর্ণনা প্রসঙ্গে শব্দটির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। অ্যারিস্টটল বলতেন– এটি হচ্ছে এক ধরনের অপকৃষ্ট আভিজাত্য। সরকারের ভেতরে সম্পদশালী ব্যক্তির হাত থাকা –এরা কিন্তু শুধুই ক্ষমতা ও অর্থের মালিক নন, প্রচুর সম্পদের উৎসগুলোর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে রাজনীতি বা সরকারের উপর অর্থপূর্ণভাবে প্রভাব বিস্তার করে। অভিধান অনুযায়ী অলিগার্ক এর সমরূপ শব্দ বা শব্দার্থগুলোর কয়েকটি হচ্ছে– কর্তৃত্ববাদী, স্বেচ্ছাচারী, মাফিয়া বা সিন্ডিকেট ইত্যাদি। এদের সম্পদ ও প্রভাবের পরিধি এতই বিশাল ও বিস্তৃত যে, পুলিৎজার পুরস্কার জয়ী আমেরিকান সাংবাদিক ও লেখক ইমানুয়েল হফম্যান রীতিমতো 'দ্য অলিগার্ক' শিরোনামে একটা বই লিখে ফেলেছেন। সমাজের বিবিধ নষ্টামিও সরকারের স্বৈরমনোভাব সৃষ্টির কারণ এই শ্রেণিটি।

বাংলাদেশে আগস্ট/২৪ পূর্ব দেড় দশকের রাজনীতিতে অলিগার্কদের উপস্থিতি দেখতে পাই। আস্তে ধীরে অথচ অতীব নিশ্চিত গতিতে এদের উত্থান ও বিকাশ দেশকে অর্থনীতির ক্ষেত্রে দেউলিয়াত্ব বরণ করতে হয়েছে। মাতার বাড়ি বিদ্যুৎ কেন্দ্র, মেট্রোরেল প্রকল্প, রূপপুর পারমাণবিক প্রকল্পে ব্যয়িত অর্থে অপচয় অবিশ্বাস্য! প্রকল্প বাস্তবায়নে অংশীজনদের অধিকাংশ ওই অপকৃষ্ট অভিজাতরা। করোনার টিকা আমদানী থেকে হেন প্রকল্প নেই যেখানে অলিগার্করা নেই। নিজ দেশ গ্লোবাল বাইওটেক আবিষ্কৃত টিকা বঙ্গভেক্স অনুমোদনে গড়িমসি করে অলিগার্করা ২২ হাজার কোটি টাকা মুনাফার নামে হাতিয়ে নেয়। ১৯৯৬-এর শেয়ারবাজার কেলেঙ্কারী বাংলাদেশের একটি চাঞ্চল্যকর ঘটনা। ওই কেলেঙ্কারীর মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের কারসাজির দ্বারা শেয়ারের দাম বাড়ায় পরবর্তীতে বাজারে পতন শুরু হয়। ফলশ্রুতিতে দেশের পুঁজি বাজারে আস্থার সংকট সৃষ্টি হয় ও সাধারণ বিনিয়োগকারীরা দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অলিগার্করা আয় করে নেয় হাজার হাজার কোটি টাকা।

রূপপুর পারমাণবিক প্রকল্পেও ব্যাপক দুর্নীতি হয়েছে বলে জানা যায়। পৃথিবীর আরো বহুদেশে এমনি প্রকল্প হয়েছে। কিন্তু খরচ অনেক কম। দুর্ভাগা বাঙালিদের অতিরিক্ত খরচের বোঝাও বহন করতে হচ্ছে। এতেও কারসাজি ছিল অলিগার্কদের। গ্লোবাল ডিফেন্স কর্পের এক প্রতিবেদন সূত্রে অবগত হওয়া যায় যে, দেশটির প্রধান নির্বাহী শেখ হাসিনাও ৫০০ কোটি ডলার

* **ভাইস-প্রেসিডেন্ট,** বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস। **প্রফেসর ও সাবেক ডিন, স্কুল অব আর্টস,** এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ।

হাতিয়ে নিয়েছেন। প্রতিবেদনে জানা যায়, প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা রোসাট্রাম মালয়েশিয়ার একটি ব্যাংকের মাধ্যমে শেখ হাসিনাকে এ অর্থ আত্মসাতের সুযোগ করে দেয়।

রাষ্ট্র পরিচালনার মালিক-মোখতারদের নগ্ন হস্তক্ষেপে বাংলাদেশের মুষ্টিমেয় ক্ষমতাশ্রয়ী ধনিক ও বণিক শ্রেণির আহরিত বিপুল অর্থ-সম্পদের উৎস এখানকার মেগা প্রকল্প, বিদ্যুৎখাত ও সমরূপ কিছু সরকারি সেবাখাতগুলো। এ সকল চোখধাঁধানে কম্পালসিভ (বাধ্যবাধকতার) উন্নয়নের সুফল সাধারণ মানুষ ভোগ করে না। যা শুধু অলিগার্ককে সমৃদ্ধ করে, গোষ্ঠিতন্ত্র গেঁড়ে বসে ও রাষ্ট্রে সমাজে সম্পদসহ সকল ক্ষেত্রের বৈষম্যকে বৃদ্ধি করে। দেশের সাধারণ মানুষের পকেট কেটে সরকারি দলের লোকজন অলিগার্কদের মতো বিত্ত বৈভবের মালিক হচ্ছেন। এর অনিবার্য কুফল হিসেবে গণতন্ত্রের যাত্রাপথ সংকুচিত হয়ে পড়ছে।

আমরা ইতিপূর্বে বলেছি যে, রাষ্ট্রযন্ত্রকে ব্যবহার করে গত দেড় দশকে স্বৈরতান্ত্রিক ও কর্তৃত্ববাদী শাসনের ফলে অর্থনীতিতে যে অলিগার্কতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তার সুবিধাভোগী ছিল সমাজের উপরতলার কয়েক শতাংশ মানুষ। অনুরূপভাবে ভারতেও জাতীয় সম্পদের ৪০% রয়েছে দেশের ১% ধনকুবের হাতে। আর বিশ্বের মাত্র ১০ শতাংশ ধনীর হাতে বিশ্বের মোট সম্পদের ৭৬% পুঞ্জীভূত। আনুপাতিক হারে বাংলাদেশও কিন্তু এর বাইরে নয়। সীমাহীন দুর্নীতি আর অবাধ লুটপাটের এই রাজনৈতিক অর্থনীতিতে ট্রিকল ডাউন বা চুঁইয়ে পড়া পদ্ধতিতে আরো কয়েক শতাংশ মানুষ সুফলভোগী হলেও সমাজের বেশিরভাগ মানুষের আয় বাড়েনি। ফলে সমাজে বৈষম্য এতটাই বেড়েছে যে, বাংলাদেশ চরম বৈষম্যের একটা দেশের দিকে পা বাড়ানোর একেবারে শেষের ধাপে পৌঁছে গেছে। অলিগার্কদের সম্পদের পরিমাণ এতই বেড়েছে যে, আল জাজিরার অনুসন্ধানী দৃষ্টি এড়ায়নি।

দরবেশখ্যাত 'স' আদ্যাক্ষরের জনৈক সাবেক বেসরকারি ও শিল্প বিনিয়োগ বিষয়ক উপদেষ্টা ও বেক্সিমকো গ্রুপের ভাইস-চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে হাজার হাজার কোটি টাকা আত্মসাৎ ও পাচারের অভিযোগ রয়েছে। এস আলম– নিজেই একটা বাক্য ধরে নিতে পারেন। সুপ্রিয় পাঠক! নিজ দেশের নাগরিকত্ব ত্যাগ করে বিদেশি বনেছেন। এখন তিনি সপরিবারে সিঙ্গাপুর ও সাইপ্রাসের নাগরিকত্ব নিয়েছেন। দেশ দু'টিতে দ্বৈত নাগরিকত্বের অনুমোদন না থাকায় ২০২২ সালের ১০ অক্টোবর এস আলম সপরিবারে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব ত্যাগ করেন। আবার একই দিনে বিদেশি নাগরিক হিসেবে বাংলাদেশে স্থায়ী বসবাসের (পারমানেন্ট রেসিডেন্সিয়াল) অনুমোদন নেন বাণিজ্যিক সুবিধা নেয়ার জন্য। ঋণ গ্রহণ করেছেন লাখ-কোটি টাকা –এ কী করে সম্ভব! একক মালিকানাধীন ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক, গ্লোবাল ইসলামী ব্যাংক, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ, সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক ও ইউনিয়ন ব্যাংক চালান তিনি। অলিগার্কদের এরা প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

আর একজন অলিগার্ক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী। ভারতীয় উপমহাদেশে সামন্ত রাজারা চৌধুরী লকবে অভিহিত হতেন। এরা যুদ্ধের জন্য নৌ, হস্তী, অশ্ব ও পদাতিক এই চার শক্তির অধিকারী হতেন। মি. সাইফুজ্জামান চৌধুরী ওরফে জাভেদ সাহেবের নৌ, হস্তী, অশ্ব ও পদাতিক ছিল না, কিন্তু ছিল অঢেল টাকা-বিত্ত-বিষয়। শুধু যুক্তরাজ্যেই তিনি ৩৬০টি বাড়ির মালিক। বাংলাদেশী টাকায় এই অর্থের পরিমাণ দাঁড়ায় তিন হাজার ৮২৬ কোটি টাকার বেশি। এর বাইরে সম্পদ আছে দুবাই ও যুক্তরাষ্ট্রে। আল জাজিরার কাছে তিনি অবলীলায় তাঁর বিলাসী জীবনের গল্প বলে গেছেন। মনোজ দে'র লেখনী থেকে উদ্ধৃত করছি, 'এটা টেইলর-মেডের জুতা। আমি হেরডসেও কাস্টম মেড জুতা অর্ডার দিয়েছি। এটি তৈরি হতে চার মাস সময় লাগে মূল্যে তিন হাজার পাউন্ডের বেশি। এগুলো উট পাখি ও কুমিরের বুকের চামড়া দিয়ে তৈরি।'

পরম সম্মানীয় পাঠকমণ্ডলী! আর যদি সম্পূর্ণ বুকের চামড়া দিয়ে জুতা তৈরি হয়, তার দাম ছয় হাজার পাউন্ড। মন্ত্রী মহোদয় হয়তোবা শেষোক্তটির অর্ডার দিয়ে ফেলেছেন? ☒

প্রবীণদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় রাসূল (ﷺ)

–মুহাম্মদ গিয়াস উদ্দিন★

প্রবীণদের যথাযোগ্য মর্যাদা, সম্মান ও অধিকার দিয়েছে ইসলাম। তাঁরা পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের বোঝা নন; বরং দুনিয়া ও পরকালের সফলতার অনন্য অনুপ্রেরণা ও মুক্তির অন্যতম মাধ্যম। প্রবীণদের প্রতি সদাচরণ, সম্মান, তাদের মর্যাদা সুরক্ষা এবং অধিকার সুনিশ্চিতে হাদীসের একাধিক বর্ণনায় তাগিদ দিয়েছেন বিশ্বনবী।

প্রবীণের পরিচয়

প্রবীণের বয়স ৬০ বছর বা তার বেশি থেকে ধরা হয়। এই প্রেক্ষাপটে ৬০ বছর বা তদূর্ধ্ব বয়স্ক মানুষকে আমরা বৃদ্ধ বলে থাকি। প্রবীণের পরিচয় দিতে গিয়ে বিভিন্ন অভিধান, বিশেষজ্ঞ ও বিশ্লেষকরা এ বিষয়ে বিভিন্ন মতামত দিয়েছেন। যেমন- প্রবীণ বলতে বাংলা একাডেমী অভিধানে বলা হয়েছে, বৃদ্ধ, যথেষ্ট বয়স্ক, বিজ্ঞ, জ্ঞানী, বহুদর্শী, অভিজ্ঞ, নিপুণ, দক্ষ ও কুশলীদেরকে বুঝানো হয়েছে।[৩৯]

বৃদ্ধ বলতে একই অভিধানে বলা হয়েছে, বুড়া, প্রবীণ, বুদ্ধিপ্রাপ্ত, বয়োজ্যেষ্ঠ, প্রাচীন, মুরুব্বি, বহু বৎসরের অভিজ্ঞদেরকে বুঝানো হয়েছে।[৪০]

সাধারণ অর্থে প্রবীণ বলা হয়, বয়স্ক ব্যক্তিকে। ইংরেজীতে Elderly, Aged, Old ইত্যাদি বলা হয়। ইবনু মানযূর বলেন, বয়োবৃদ্ধ বা প্রবীণ লোক। অন্য অর্থে, বয়োবৃদ্ধ।[৪১]

প্রবীণ বলতে বাংলা একাডেমীর Bengali-English Dictionary-তে বলা হয়েছে, elderly, old, aged, wise, experienced, judicious and skillful.[৪২]

According to Thesaurus Dictionary, Òthe last period of human life, now often considered to be the years after 65.

According to the Dictionary of Britannica, Òthe Old age is also called senescence.

প্রবীণদের বিশেষ মর্যাদা

রাসূল (ﷺ) বলেছেন, ‘আমি কি তোমাদের মধ্যে উত্তম ব্যক্তির সংবাদ দেব না? তারা বলল, হ্যাঁ, আল্লাহর রাসূল (ﷺ)! তিনি বলেন, তোমাদের মধ্যে ওই ব্যক্তি উত্তম যে দীর্ঘ আয়ু লাভ করে এবং সুন্দর ‘আমল করে।’[৪৩]

আবূ মূসা আল আশ‘আরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, নিশ্চয়ই সাদা শুভ্র চুলবিশিষ্ট বৃদ্ধ মুসলিমকে সম্মান করা, কুরআনের ধারক-বাহক ও ন্যায়পরায়ণ শাসকের প্রতি সম্মান দেখানো মহান আল্লাহর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের অন্তর্ভুক্ত।[৪৪]

এ ধরনের বিশেষ মর্যাদা কেবল সাদা চুলবিশিষ্ট আমাদের বৃদ্ধ পিতা-মাতার জন্য। আমাদের ভাগ্যে এই মর্যাদা নাও মিলতে পারে। আর এমন বৃদ্ধ মানুষ পৃথিবীতে আছে বিধায় এ ধরা কল্যাণ ও বরকতময়। রাসূল (ﷺ) বলেন, ‘প্রবীণদের সাথেই তোমাদের কল্যাণ, বরকত রয়েছে।’[৪৫]

প্রকৃত ইসলাম ধর্ম আহ্বান জানায় অধিক বয়স্ক মুসলিম ব্যক্তিকে সম্মান করার প্রতি। তাই তিনি কোনো সভার মধ্যে থাকলে তাঁকে অন্তর থেকে শ্রদ্ধা করা, তাঁর সাথে ভদ্রতা, নম্রতা বজায় রাখা এবং তাঁর প্রতি দয়া করা ইত্যাদি এই সমস্ত বিষয়গুলো আল্লাহরই সম্মান করার নামান্তর।

প্রবীণদের অসম্মানে কঠোর হুঁশিয়ারি

প্রবীণ ও মুরব্বিদেরকে সম্মান প্রদর্শন না করলে রাসূল (ﷺ) কঠোর বাণী উচ্চারণ করেছেন। জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আনাস ইবনু মালিককে (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আমি বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, ‘একজন বয়স্ক লোক রাসূল (ﷺ)-এর সঙ্গে দেখা করতে আসল। লোকেরা তার জন্য পথ ছাড়তে বিলম্ব করে। তা দেখে রাসূল (ﷺ) বললেন, যে ব্যক্তি আমাদের ছোটদের স্নেহ করে না এবং আমাদের বড়দের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে না, সে আমাদের উম্মত নয়।’[৪৬]

প্রবীণ পিতা-মাতার প্রতি করণীয়

আল্লাহ তা‘আলা পিতা-মাতার প্রতি যথাযোগ্য মর্যাদা প্রদানের নির্দেশ দিয়ে বলেন,

---

★ *পুস্তক প্রণেতা ও গবেষক।*

[৩৯] *আহমাদ ও অন্যান্য (সম্পা.); বাংলা একাডেমী সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান- ঢাকা: বাংলা একাডেমী, অক্টোবর-১৯৯৯, পৃ. ৩৬৭।*

[৪০] *প্রাগুক্ত- পৃ. ৪১৮।*

[৪১] *লিসানুল আরব- আল্লামা ইবনু মানযূর, ১২/৬০৭, ১৩/২২২।*

[৪২] *Mohammad Ali Et al (eds.) Benguli-English Dictionary, Dhaka: Bangla Academy, October 2001, p. 467।*

[৪৩] *মুসনাদে আহমাদ- হা. ৭২১২।*

[৪৪] *সুনান আবূ দাউদ- হা. ৪৮৪৩।*

[৪৫] *সুনান আন্ নাসায়ী- হা. ৩১৭৯; সুনান আবূ দাউদ- হা. ২৫৯৪; মুসনাদে আহমাদ- হা. ২১৭৩১, সনদ সহীহ।*

[৪৬] *সুনান আত্ তিরমিযী- হা. ১৯১৯।*

"তোমার প্রতিপালক আদেশ দিয়েছেন তিনি ব্যতীত অন্য কারও 'ইবাদত না করতে ও পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করতে। তাদের একজন অথবা উভয়েই তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হলে তাদেরকে 'উফ' বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিয়ো না; তাদের সাথে সম্মানসূচক কথা বলো। মমতাবশে তাদের প্রতি নম্রতার পক্ষপুট অবনমিত করো এবং বলো, 'হে আমার প্রতিপালক! তাদের প্রতি দয়া করো যেভাবে শৈশবে তারা আমাকে প্রতিপালন করেছিলেন'।"[৪৭]

অনেক সন্তান বৃদ্ধ পিতা-মাতার সঙ্গে খারাপ আচরণ করে। এমনকি মারধর পর্যন্ত করে, স্ত্রীকে খুশি করার জন্য বৃদ্ধ পিতা-মাতাকে অচেনা জায়গায় ফেলে আসা, দূরপাল্লার গাড়ীতে তুলে দিয়ে পালিয়ে আসা, ডাক্তার দেখানোর কথা বলে জমি দলিল করে নিয়ে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে রাস্তায় বের করে দেওয়া, হাসপাতালে ভর্তির কথা বলে বৃদ্ধাশ্রমে রেখে আসার মতো ন্যক্কারজনক ঘটনার কথা প্রায়ই পত্র-পত্রিকায় দেখা যায়। অথচ আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ হলো– তাদের সঙ্গে এমন আচরণ তো দূরের কথা 'উহ' শব্দও করা যাবে না; বরং শ্রদ্ধাভরে নম্রভাবে তাদের সঙ্গে কথা বলতে হবে। সর্বক্ষণ তাদের জন্য মহান আল্লাহর শেখানো দু'আ করতে হবে, যেন তাদের উভয়ের প্রতি আল্লাহ তা'আলা রহম করেন।

এখানেই শেষ নয়, পিতা-মাতা অমুসলিম হলেও তাদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখার নির্দেশ দিয়েছে ইসলাম। এক কথায়, প্রবীণদের যথাযথ শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করা মুসলমানদের দায়িত্ব। তাদের প্রয়োজন পূরণ করা সবার কর্তব্য। বিশেষ করে নিকটাত্মীয়দের এটা মানবিক দায়িত্বও বটে।

'ইবাদতে প্রবীণদের বিশেষ সুবিধা

প্রবীণদের জন্য সুবিধাজনকভাবে 'ইবাদত-বন্দেগির সুযোগ রয়েছে।

১. সালাত আদায়ে বিশেষ সুবিধা প্রদান: দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করতে অক্ষম প্রবীণ ব্যক্তিদের সুবিধাজনকভাবে সালাত আদায়ের অনুমতি প্রদান করেছে ইসলাম। 'ইমরান ইবনু হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি অর্শ্ব রোগে ভুগছিলাম। এমতাবস্থায় রাসূল (ﷺ)-কে সালাত আদায় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, 'দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করো। যদি অক্ষম হও তবে বসে পড়। যদি তাতেও অক্ষম হও তবে শুয়ে শুয়ে পড়ো'।[৪৮]

এমনকি প্রবীণদের সম্মানে রাসূল (ﷺ) ইমামকে সালাত সংক্ষিপ্ত করার নির্দেশ দিয়েছেন,

আবূ মাস'ঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক সাহাবী এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর শপথ! আমি অমুকের কারণে ফজরের সালাতে অনুপস্থিত থাকি। তিনি (জামা'আতে) সালাতকে খুব দীর্ঘ করেন। আবূ মাস'ঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-কে নসীহাত করতে গিয়ে সে দিনের ন্যায় এতো অধিক রাগান্বিত হতে আর কোনোদিন দেখিনি। তিনি বলেন, তোমাদের মাঝে বিতৃষ্ণা সৃষ্টিকারী রয়েছে। তোমাদের মধ্যে যে কেউ অন্য লোক নিয়ে সালাত আদায় করে, সে যেন সংক্ষেপ করে। কেননা, তাদের মধ্যে দুর্বল, বৃদ্ধ ও হাজতওয়ালা লোকও থাকে।[৪৯]

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করে, তখন যেন সে সংক্ষেপ করে। কেননা, তাদের মাঝে দুর্বল, অসুস্থ ও বৃদ্ধ রয়েছে। আর যদি কেউ একাকী সালাত আদায় করে, তখন ইচ্ছামত দীর্ঘ করতে পারে।[৫০]

২. সাওম পালনের ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা প্রদান: অতি বৃদ্ধ বা প্রবীণ ব্যক্তি সাওম পালনে অক্ষম হলে প্রতিদিনের সাওমের বিনিময়ে একজন করে মিসকীনকে খাদ্য খাওয়াবে। 'আত্বা (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, তিনি ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)- কে পাঠ করতে শুনেছেন যে, তিনি পাঠ করছিলেন, 'আর যাদের জন্য এটি (সিয়াম পালন) খুব কষ্টকর হবে, তারা যেন এর পরিবর্তে একজন করে অভাবীকে খাদ্য দান করে' –এর ব্যাখ্যায় ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, 'সিয়াম পালনে অক্ষম বৃদ্ধ-বৃদ্ধার প্রত্যেক দিনের (প্রতিটি সিয়ামের) পরিবর্তে একজন মিসকীনকে খাদ্য খাওয়ানোর বিধান সংবলিত উক্ত আয়াতটি রহিত হয়নি'।[৫১]

৩. হজ্জের ক্ষেত্রে বিশেষ সুযোগ: অক্ষম প্রবীণ বা বৃদ্ধ ব্যক্তির পক্ষ থেকে সক্ষম ব্যক্তির মাধ্যমে হজ্জ করানো ইসলামে বৈধ। ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি

[৪৭] *সূরা বানী ইসরা-ঈল: ২৩-২৪।*

[৪৮] *সহীহুল বুখারী- হা. ১১১৭।*
[৪৯] *সহীহুল বুখারী- হা. ৭০২।*
[৫০] *সহীহুল বুখারী- হা. ৭০৩।*
[৫১] *সহীহুল বুখারী- হা. ৪৫০৫।*

বলেন, 'বিদায় হজ্জের বছর খাসআম গোত্রের একজন মহিলা এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! মহান আল্লাহর তরফ হতে বান্দার উপর যে হজ্জ ফর্‌য হয়েছে তা আমার বৃদ্ধ পিতার উপর এমন সময় ফর্‌য হয়েছে যখন তিনি সওয়ারীর উপর ঠিকভাবে বসে থাকতে পারেন না। আমি তার পক্ষ থেকে হজ্জ করলে তার হজ্জ আদায় হবে কি? তিনি বললেন, হবে'।[৫২]

ইমামতিতেও প্রবীণদের অগ্রাধিকার

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) প্রবীণদের নামাযের ইমামতিতেও অগ্রাধিকার দিয়েছেন। হাদীসে এসেছে–

আবূ মাস'ঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাদের বললেন, মহান আল্লাহর কিতাব কুরআন মাজিদের জ্ঞান যার সবচেয়ে বেশি এবং যে কুরআন তিলাওয়াত সুন্দরভাবে করতে পারে, সে-ই নামাযের জামা'আতে ইমামতি করবে। সুন্দর কিরআতের ব্যাপারে সবাই যদি সমান হয় তাহলে তাদের মধ্যে যে হিজরতে অগ্রগামী সে ইমামতি করবে। হিজরতের ব্যাপারেও সবাই যদি সমান হয় তাহলে তাদের মধ্যে যে বয়সে প্রবীণ সে-ই ইমামতি করবে।'[৫৩]

প্রবীণদের ব্যাপারে জিব্‌রা-ঈল (আলাইহিস সালাম)-এর বক্তব্য

প্রবীণদের ব্যাপারে রাসূল (ﷺ)-কে জিব্‌রা-ঈল (আলাইহিস সালাম) বলেছেন, প্রবীণ ব্যক্তিদেরকে সব বিষয়ে অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে এ সম্পর্কে রাসূল (ﷺ) বলেন, আমাকে জিব্‌রা-ঈল জানিয়েছেন আমি যেন বয়সে প্রবীণদেরকে অগ্রগামি রাখি।[৫৪]

রাসূল (ﷺ)-কে পানি পরিবেশন করা হলে তিনি বলতেন তোমরা শুরু করো প্রবীণদের থেকে।[৫৫]

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বন্দি মুসলিম বৃদ্ধের সম্মানে অমুসলিম বন্দি বিনিময় করেন

বদর যুদ্ধে আবূ সুফিয়ান-এর ছেলে 'আম্‌র' বদর যুদ্ধে বন্দি হলে তার দায়িত্বভার রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর উপর বর্তায়। আবূ সুফিয়ানের হানযালা নামক ছেলেটি বদর যুদ্ধে নিহত হয়েছে। আবূ সুফিয়ান মুক্তিপণের কথা শুনে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বললেন: 'আমি রক্তও দিবো, আবার রক্তপণও দিবো? তা হবে না। তোমরা তাঁকে তাদের (মুসলমানদের) হাতে ছেড়ে দাও। তাদের যা ইচ্ছা তাই করুক।' তাই 'আম্‌র' রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে বন্দি রইলো।

এদিকে মদীনা মুনাওয়ারার 'বানু 'আম্‌র ইবনু আওফ গোত্রের সাদ ইবনু নু'মান নামক একজন মুসলিম বৃদ্ধ মক্কায় 'উমরাহ্ আদায় করতে গেলেন। বদর যুদ্ধের পরে পরিস্থিতি খুবই উত্তেজনাকর ছিল। মক্কায় কুরাইশদের সাথে চুক্তি ছিল, 'কেউ মক্কায় 'উমরাহ্ বা হজ্জ পালন করতে গেলে তাঁকে বাধা দিবে না এবং কোনো সমস্যা করবে না; বরং ভালো ব্যবহার করবে'। কিন্তু মক্কার আবূ সুফিয়ান চুক্তি ভঙ্গ করে সাদ ইবনু নু'মান (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর ওপর চড়াও হলো এবং ছেলে 'আমর'-এর কারণে তাঁকে বন্দি করলো।

এ খবর মদীনায় পৌঁছলে 'বানূ 'আম্‌র ইবনু আওফ' রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে গেল। তারা সংবাদ দেয়ার পরে একটি প্রস্তাব দিলো যে, উক্ত বৃদ্ধের বিনিময়ে আবূ সুফিয়ানের ছেলে 'আমর'-কে মুক্ত করে দেয়া হোক। তৎক্ষণাৎ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কোনো মুক্তিপণ ছাড়াই আবূ সুফিয়ানের ছেলেকে মুক্ত করে দিলেন। তারা 'আমর'-কে আবূ সুফিয়ানের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। এর বিনিময়ে আবূ সুফিয়ান সাদ ইবনু নুমান নামক বৃদ্ধকে ছেড়ে দিলেন।[৫৬]

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) প্রবীণদের কথা মনোযোগ সহকারে শুনতেন

একদিন মক্কার কুরাইশ নেতা 'উত্বাহ্ ইবনু রবী'আহ্ মক্কী জীবনের প্রথমদিকে এসে লম্বা আলোচনা করলো নবীজীকে তাওহীদের দাওয়াত প্রদান থেকে বিরত রাখার জন্য। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) খুব মনোযোগের সাথে ধৈর্য সহকারে তার কথা শুনলেন।

'উত্বাহ্ প্রশ্ন করলো: ভাতিজা! তুমি উত্তম না-কি 'আব্দুল্লাহ উত্তম? তুমি উত্তম না-কি আব্দুল মুত্তালিব উত্তম? রাসূলুল্লাহ (ﷺ) নীরব থাকলেন বৃদ্ধ 'উত্বাহ্‌কে সম্মান দেখিয়ে। বিনম্র অবস্থা দেখে 'উত্বাহ্ আরো বললো: তুমি যদি মনে করো, তারা উত্তম তবে তোমার চেয়ে তারা অনেক দেব-দেবীর উপাসনা করতেন। আর তুমি যদি মনে করো তাদের চেয়ে তুমি উত্তম, তাহলে তোমার যা ইচ্ছা তাই বলো। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, তুমি গোটা আরবদের কাছে আমাদেরকে অসম্মান করলে। সবাই এখন বলছে, কুরাইশ বংশে একজন

---

[৫২] *সহীহুল বুখারী- হা. ১৮৫৪; সহীহ মুসলিম- হা. ১৩৩৫।*
[৫৩] *সহীহ মুসলিম- হা. ৬৭৩।*
[৫৪] *মুসনাদ আহমাদ- হা. ৬২২৬।*
[৫৫] *আল্লামা হাইসামী মাযমাউয যাওয়ায়িদ- ৫/৮৪।*
[৫৬] *সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ ফী সীরাতে খাইরিল ইবাদ- মুহাম্মাদ ইবনু ইউসুফ আশ-শামী, ৪/৭০।*

জাদুকর জন্ম নিয়েছে, আবার কেউবা বলছে গণক জন্ম নিয়েছে। তুমি আসলে চাচ্ছো যে, আমরা নিজেরা পরস্পর যুদ্ধ করে শেষ হয়ে যাই।[৫৭]

'উত্বাহ্ আরো বললো: ভাতিজা! তুমি যদি চাও যে, তুমি সম্পদশালী হবে তাহলে আমরা তোমাকে আমাদের সম্পদ দিয়ে ধনী করে দিবো। আর যদি তুমি নেতৃত্ব চাও তাহলে আমরা তোমাকে নেতা বানিয়ে দিলাম, তোমার সিদ্ধান্ত ছাড়া এক চুল পরিমাণও নড়ব না। আর যদি তুমি রাজ্য চাও তাহলে আমরা তোমাকে আমাদের রাজ্য দিলাম, আমরা তোমার প্রজা হয়ে থাকবো। আর যদি তোমার মধ্যে ভূতের আছর হয়ে থাকে তাহলে আমরা ওঝা-বৈদ্য চিকিৎসক নিয়ে আসবো, তোমাকে আসরমুক্ত করার জন্য। অনেক সময় এরকম হয়ে থাকে, তাই এর চিকিৎসা করা দরকার।

নবীজী (ﷺ) খুব মনোযোগ ও অত্যন্ত ধৈর্য সহকারে বৃদ্ধ 'উত্বার কথা শুনে বললেন: হে আবুল ওয়ালীদ ('উত্বাহ্)! আপনার কথা কি শেষ হয়েছে? সে বললো, হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন: তাহলে এখন আমার কথা শুনুন। সে বললো, আচ্ছা ঠিক আছে, বলো। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সূরা হা-মীম আস সাজদার প্রথম আয়াত থেকে ৩৮ আয়াত পর্যন্ত পড়ে শুনালেন। সেটা সিজদার আয়াত হওয়াতে তিলাওয়াতে সিজদা দিলেন। পরে 'উত্বাহ্ প্রভাবিত হয়ে ফিরে গেলেন এবং সবাইকে বললেন: এটা এক মহাবাণী। এটা কোনো কবির কবিতা নয় কোনো গণকের গণনা নয়; কোনো যাদুকরের যাদুও নয়।[৫৮]

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কখনো কখনো বৃদ্ধদের সাথে কৌতুক করতেন

জনৈকা বৃদ্ধা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে এসে কিছু জানতে চাইলেন। উত্তর পাওয়ার পর বৃদ্ধা চলে যাচ্ছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কৌতুক করে বললেন: "বৃদ্ধা নারী জান্নাতে যেতে পারবে না।"

বৃদ্ধা তা শুনে ফিরে এসে প্রশ্ন করলো: কেন হে আল্লাহর রাসূল? উত্তরে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন: আপনি জান্নাতে যাবেন, কিন্তু বৃদ্ধা অবস্থায় নয়। তখন আপনি যুবতী অবস্থায় যাবেন। বৃদ্ধা খুশি হয়ে চলে গেলেন।[৫৯]

বসার ক্ষেত্রে প্রবীণদের অগ্রাধিকার দেওয়া

উবায়দুল্লাহ ইবনু 'উমার বলেন, আমি সোলায়মান ইবনু 'আলীর নিকট ছিলাম। এ সময় কোরাইশ গোত্রের জনৈক প্রবীণ ব্যক্তি প্রবেশ করলো। সোলায়মান বললেন, এই প্রবীণ ব্যক্তির দিকে লক্ষ্য করো, তাকে উপযুক্ত আসনে বসাও।[৬০]

কথা বলার ক্ষেত্রে প্রবীণদের অগ্রাধিকার দেওয়া

একবার 'আব্দুল্লাহ ইবনু সাহ্ল ও মুহাইয়াসা খাদ্যের অভাবে খায়বারে আসেন। ঘটনাক্রমে 'আব্দুল্লাহ নিহত হলে রাসূল (ﷺ)-এর নিকট ঘটনাটি বলার জন্য মুহাইয়াসা অগ্রসর হয়। তখন রাসূল (ﷺ) মুহাইয়াসাকে বললেন, বড়কে কথা বলতে দাও; বড়কে কথা বলতে দাও। তিনি এতে উদ্দেশ্য করেছেন বয়সে প্রবীণ ব্যক্তিকে।[৬১]

প্রবীণদের সম্মান করার প্রতিদান

আনাস ইবনু মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূল (ﷺ) বলেছেন, যে যুবক প্রবীণ ব্যক্তিকে সম্মান করবে, আল্লাহ তার জন্য এক ব্যক্তি নিযুক্ত করবেন যে তাকে তার প্রবীণ বয়সে সম্মান করবে।

প্রবীণ ও বয়োজ্যেষ্ঠ মুরুব্বিরা সব সময় শ্রদ্ধার পাত্র। যথোপযুক্ত সম্মানের পাশাপাশি তাঁদের সার্বিক যত্ন নেওয়া মানবতা ও ঈমানের দাবি; বরং প্রবীণদের যথাযথ মূল্যায়ন করার মধ্যেই একটি সমাজের কল্যাণ। রাসূল (ﷺ) বলেন, 'প্রবীণদের সঙ্গেই তোমাদের কল্যাণ, বরকত আছে।'[৬২]

বয়োবৃদ্ধ প্রবীণদের করণীয়

বৃদ্ধ বয়সে প্রবীণদের করণীয় হলো– যথাসাধ্য 'ইবাদত-বন্দেগিতে নিয়োজিত থাকা। অনেক প্রবীণ ব্যক্তির মেজাজ খিটখিটে থাকে। 'ইবাদত-বন্দেগিতে মনোযোগী হলে খিটখিটে ভাব থাকে না। তাই প্রবীণ বয়োবৃদ্ধদের জন্য বেশি বেশি তাসবিহ, তাহলিল, দু'আ-দরূদ, তাওবাহ-ইসতেগফারে সময় অতিবাহিত করা জরুরি। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

"হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহর নিকট তাওবাহ্ করো; বিশুদ্ধ তাওবাহ্। সম্ভবত তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের মন্দ কর্মগুলো মোচন করে দেবেন এবং

---

[৫৭] *আস সীরাতুল হালাবিয়্যা- ১/৪৫৬।*
[৫৮] *আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যা- ইবনু হিশাম, ১/২৯৩।*
[৫৯] *শামাইলুত তিরমিযী- হা. ৩৬২৪।*
[৬০] *মুসনাদ আহমাদ- হা. ৪৬০।*
[৬১] *সহীহুল বুখারী- হা. ৭১৯২।*
[৬২] *সহীহ ইবনু হিব্বান- হা. ৫৫৯; মুস্তাদরাক হাকিম- হা. ২১০।*

তোমাদের দাখিল করবেন জান্নাতে, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত। সেদিন আল্লাহ লজ্জা দেবেন না নবীকে এবং তাঁর মু'মিন সঙ্গীদেরকে। তাদের জ্যোতি তাদের সম্মুখে ও দক্ষিণ পার্শ্বে ধাবিত হবে। তারা বলবে– 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জ্যোতিকে পূর্ণতা দান করো এবং আমাদের ক্ষমা করো; নিশ্চয় তুমি সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান'।"[৬৩]

প্রবীণরা মহান আল্লাহর কাছে বেশি বেশি এ দু'আ করবে– 'আল্লাহুম্মা ইন্নি আউজুবিকা মিনাল ঝুবনি ওয়া আউজুবিকা মিনাল বুখলি ওয়া আউজুবিকা মিন আরজালিল উমুরি ওয়া আউজুবিকা মিন ফিতনাতিদ দুনইয়া ওয়া আজাবিল কাবরি।'

অর্থঃ 'হে আল্লাহ! তোমার কাছে আমি ভীরুতা থেকে আশ্রয় চাই, তোমার কাছে কৃপণতা থেকে আশ্রয় চাই, তোমার কাছে অতি বার্ধক্যে পৌঁছার বয়স থেকে আশ্রয় চাই এবং তোমার কাছে দুনিয়ার ঝগড়া-বিবাদ ও কবরের শাস্তি থেকে আশ্রয় চাই।'[৬৪]

প্রবীণদের পরিবারের বোঝা মনে না করা

বৃদ্ধ বয়সে মা-বাবা শিশুদের মতো হয়ে যান। শিশুসুলভ আচরণ করেন। তারা যেমন করে আমাদেরকে শৈশব থেকে শুরু করে শত ত্যাগ-তিতিক্ষা স্বীকার করে মানুষ করেছেন। আমাদেরও কতর্ব্য সেই মানুষগুলোকে জীবনের শেষ সময়টুকুতে বৃদ্ধাশ্রম নামক কারাগারে না রেখে নিজের কাছে রেখে সেবা করা। কিছু পরিবার তাদের বৃদ্ধদের পরিবারের বোঝা মনে করে। তাদের ধারণা সন্তান লালন পালনে ভবিষ্যত রয়েছে। তাদের পিছনে খরচ করলে তারা বড় হয়ে আবার তাদের দেখাশুনার ভার গ্রহণ করবে। অপরদিকে বৃদ্ধরা জরাগ্রস্ত, অসহায়, নিষ্কর্মা দুর্বল হয়ে যাবে। তাদের দ্বারা ভবিষ্যতে কোনো উপকার পাওয়া যাবে না। তাদের লালন পালন করে লাভ হবে না। এমন বৃদ্ধদের পেছনে অর্থ ব্যয় করা অনর্থক ভেবে, পরিবারের বোঝা মনে করে, অবহেলা ভরে তাদের সাথে অন্যায় আচরণ করে বলে অনেকে বৃদ্ধাশ্রমে আশ্রয় নেন।

পরিবারই হলো প্রবীণদের আসল ঠিকানা

প্রবীণদের জীবনকাল বিসর্জনের মাধ্যমেই গড়ে উঠেছে আমাদের এই আধুনিক উন্নতমানের সুন্দর সমাজ ব্যবস্থা। প্রবীণরা হলো এই সুন্দর জীবন ও সুন্দর সমাজ ব্যবস্থার রচিয়তা। তাদের প্রতি কোনো বৈষম্য নয়, কোনো করুণা নয় কোনো অবহেলা নয়; বরং প্রদর্শন করতে হবে নৈতিক, আদর্শিক ও ধার্মিক মহা প্রতিদান। তারাই আমাদের জীবনের শত প্রেরণার নিরন্তর উৎস, জীবন্ত কিংবদন্তি। একজন সক্ষম মানুষ তার জীবনের পুরোটা সময় শেষ করে দেয় যে পরিবারের জন্য, জীবনের শেষ সময়ে সেই পরিবারে থাকাটা তার নৈতিক অধিকার। আর এই অধিকার হলো আল্লাহ প্রদত্ত। এটা তাদের প্রতি কোনো দয়া নয়। কোনো অনুগ্রহ নয়। সুতরাং পরিবারই হচ্ছে প্রবীণদের আসল ঠিকানা। অথচ বাবা-মা প্রবীণ হয়ে গেলে আজকের সন্তানরা তাদেরকে বৃদ্ধাশ্রমে রেখে আসেন। কিন্তু বৃদ্ধাশ্রমে বাবা-মায়ের মনের যে লুকানো আকুতি তা সন্তানরা দেখতে পায় না। এটা ভেবে দেখে না যে, সেই সন্তানরাও একদিন প্রবীণ হবে, একদিন তাদেরই সন্তান একই আচরণ তাদের সাথেও করতে পারে। কাজেই সন্তানের জীবদ্দশায় কোনো বাবা-মাকেই যেন বৃদ্ধাশ্রমে থাকতে না হয়। পরিবারই যেন হয় প্রতিটি প্রবীণের নিজ আবাস, এটাই আমাদের সকলের প্রত্যাশা।

বিশ্বব্যাপী গড়ে উঠেছে বৃদ্ধাশ্রম। সে ধারাবাহিকতা শুরু হয়েছে বাংলাদেশেও। বিদেশিদের অনুকরণে দেশে ব্যাপক হারে বৃদ্ধাশ্রম অবাধে বাড়তে থাকলে হাজার বছরের পারিবারিক ঐতিহ্য ও মূল্যবোধ, স্নেহ-প্রীতি, মায়া-মমতার বন্ধন ধ্বংসের পথে ধাবিত হবে। বিলুপ্ত হবে প্রবীণদের প্রতি শ্রদ্ধা, সম্মান ও ভালোবাসা। আর নিঃসন্দেহে মানুষের প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে ধ্বংস এবং 'আযাব পতিত হবে। সুতরাং প্রবীণদের সেবা-যত্নের প্রতি গুরুত্ব দিতে সচেতন হওয়া ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা খুবই জরুরি। সামাজিক দায়বদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন হওয়ার পাশাপাশি যশ-খ্যাতি ও ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে বৃদ্ধাশ্রম গড়ে না তুলে প্রবীণদের প্রতি ভালোবাসা তৈরিই হোক সময়ের দাবি। প্রবীণরা যে কোনো ধর্ম বর্ণ গোত্রের লোকই হোক না কেন, সব সময় তাদের সম্মানের চোখে দেখতে হবে। প্রয়োজনীয় দেখাশুনা, খাবার-দাবার, যত্ন-চিকিৎসা, বস্ত্র-বাসস্থান; তাদের সবকিছুই হতে হবে মানসম্মত। তবেই দুনিয়া ও পরকালে পাওয়া যাবে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি। ☒

---

[৬৩] *সূরা আত্ তাহরীম: ৮।*
[৬৪] *সহীহুল বুখারী- হা. ২৮২২।*

মৌমাছি প্রসঙ্গ

মহান আল্লাহর বিশেষ বড় নিয়ামত

–অধ্যাপক মো. আবুল খায়ের*

এই পৃথিবীতে পরম করুণাময় আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীনের দেওয়া দু’টি চোখ দিয়ে আমরা যা কিছু দেখতে পাই তা সবই তাঁর দান, সবই তাঁর নিয়ামত। কোটি কোটি নিয়ামত তিনি সৃষ্টি করেছেন সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষের কল্যাণের জন্য এবং সৃষ্টি সম্পর্কে মানুষের গবেষণা করার জন্য। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এ কল্যাণগুলো বিনা পয়সায় হয় বলে এগুলোর প্রতি আমাদের গবেষণাতো দূরের কথা, চিন্তা করারও সময় হয় না। তাই সম্মানিত পাঠকমণ্ডলীগণের উদ্দেশ্যে বলতে চাই– আসুন, আমরা মহান আল্লাহর কোটি কোটি সৃষ্টির মধ্যে অতী ক্ষুদ্রতম একটি প্রাণী মৌমাছির সৃষ্টি এবং আমাদের কল্যাণে তাদের অবদান সম্পর্কে একটু জানার চেষ্টা করি।

প্রথমেই দেখা যাক, মৌমাছি সম্পর্কে আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীন পবিত্র কুরআনুল কারীমে কি বলেছেন। পবিত্র কুরআন মাজিদে আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীন বলেন,

﴿وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ○ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾

অর্থ: “তোমার প্রতিপালক মৌমাছিকে তার অন্তরে ইঙ্গিত দ্বারা নির্দেশ দিয়েছেন, গৃহ নির্মাণ করো পাহাড়ে, বৃক্ষে ও মানুষ যে গৃহ নির্মাণ করে তাতে; এরপর প্রত্যেক ফল হতে কিছু কিছু আহার করো, অতঃপর তোমার প্রতিপালকের সহজ পথ অনুসরণ করো।”[৬৫]

তার উদর হতে নির্গত হয় বিবিধ বর্ণের পানীয়, যাতে মানুষের জন্য রয়েছে আরোগ্য। অবশ্যই এতে রয়েছে নিদর্শন চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য।

মূলতঃ মৌমাছিদের প্রতি লক্ষ করলে দেখা যায় এরা সমাজবদ্ধভাবে বসবাস করে। সে জন্য আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীন বলেছেন,

﴿وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُم مَّا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ﴾

অর্থ: “আর যত প্রকার প্রাণী পৃথিবীতে বিচরণশীল রয়েছে এবং দু’ডানা বিশিষ্ট যত প্রকার পাখী উড়ে বেড়ায় তারা সবাই তোমাদের মতো এক একটি সমাজ। আমি কোনো কিছু লিখতে ছাড়িনি। অতঃপর সবাই স্বীয় প্রতিপালকের কাছে সমবেত হবে।”[৬৬]

আয়াতের অর্থানুসারে দেখা যায় মানুষ যেমন সমাজবদ্ধভাবে বসবাস করে, সমাজে যেমন বিভিন্ন নিয়ম-কানুন মেনে চলতে হয় ঠিক মৌমাছিরাও সমাজবদ্ধভাবে বসবাস করে তারাও বিভিন্ন নিয়ম-কানুন মেনে চলে থাকে।

প্রকৃতপক্ষে ছোট্ট প্রাণী হিসেবে জ্ঞান, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও সুকৌশলের দিক দিয়ে মৌমাছি সমস্ত জন্তুর মধ্যে বিশেষ বৈশিষ্টের অধিকারী। যেটি আল্লাহ “ইলান্নাহলি” শব্দটির মাধ্যমে তাদের অন্তরে ইংগিত দিয়েছেন। এ জন্য আল্লাহ তাদেরকে স্বতন্ত্র ভঙ্গিতে সম্বোধনও করেছেন “ওয়া আওহা রব্বুকা” বলে।

আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীন মৌমাছিদেরকে যে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি দিয়ে অন্য জন্তুদের তুলনায় বিশেষ মর্যাদা দান করেছেন তা তাদের শাসন ব্যবস্থার মাধ্যমে সুন্দর রূপে অনুমান করা যায়। এই দুর্বল প্রাণীর জীবন ব্যবস্থা মানুষের রাজনীতি ও শাসননীতির সাথে চমৎকার সাদৃশ্য রয়েছে। সমগ্র আইন-শৃঙ্খলা একটি বড় আকৃতির মৌমাছির উপর অর্পিত থাকে এবং সে-ই সকল মৌমাছির শাসক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তার চমৎকার সাংগঠনিক দক্ষতা ও সুন্দর কর্মবন্টনের ফলে গোটা ব্যবস্থা বিশুদ্ধ ও সুশৃঙ্খলরূপে পরিচালিত হয়ে থাকে। তার অভাবনীয় ব্যবস্থা ও অলঙ্ঘনীয় আইন ও বিধিমালা দেখে মানব-বুদ্ধি বিস্ময়ে অভিভূত হতে হয়। স্বয়ং এই “রানী মৌমাছি” তিন সপ্তাহ সময়ের মধ্যে ছয় হাজার থেকে বারো হাজার পর্যন্ত ডিম দেয়। দৌহিক গড়ন ও অঙ্গসৌষ্ঠবের দিক দিয়ে সে অন্য মৌমাছিদের চাইতে ভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। তার

---

* *সহকারী অধ্যাপক, বোয়ালিয়া মুক্তিযোদ্ধা কলেজ ও খতীব, মুরারী কাঠি জমঈয়তে আহলে হাদীস মসজিদ, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।*

[৬৫] *সূরা আন্ নাহ্ল: ৬৮ এবং ৬৯।*

[৬৬] *সূরা আল আন‘আম: ৩৮।*

কর্ম বন্টন পদ্ধতি অনুসারে প্রজাদেরকে বিভিন্ন দায়িত্বে নিযুক্ত করে। যেমন- (১) কেউ দ্বার রক্ষকের দায়িত্ব পালন করে। অজ্ঞাত ও বাইরের কাউকে ভেতরে আসতে দেয় না। (২) কেউ কেউ ডিমের হিফাযত করে। (৩) কেউ কেউ অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশুদের লালন-পালনের দায়িত্বে নিয়োজিত থাকে। (৪) কেউ স্থাপত্য ও ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়কর্ম সমাধা করে। তাদের তৈরিকৃত অধিকাংশ চাকে বিশ হাজার পর্যন্ত ঘর থাকে। (৫) কেউ কেউ মোম সংগ্রহ করে স্থপতিদের কাছে পৌঁছে দিয়ে থাকে। তারা উক্ত মোম দ্বারা নিজেদের গৃহ নির্মাণ করে। বিভিন্ন উদ্ভিদের উপর জমে থাকা সাদা ধরনের গুড়া সংগ্রহ করে এই মোম তৈরি করে। বিশেষ করে আখের গায়ে এই সাদা গুড়া প্রচুর পরিমানে বিদ্যমান থাকে। (৬) কেউ কেউ বিভিন্ন প্রকার ফুল ও ফলের উপর বসে রস চুষে থাকে। এই রস তাদের পেটে পৌঁছে মধুতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। উল্লেখ্য এই মধুই তাদের এবং তাদের সন্তানদের খাদ্য। শুধু তাই নয়, এটি আমাদের ও সবার জন্য সুস্বাদু খাদ্যনির্যাস এবং আরোগ্য লাভের অন্যতম একটি ব্যবস্থাপত্র হিসেবে ব্যবহারিত হয়। আর এ আরোগ্য লাভের কথা স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন পবিত্র কুরআন মাজিদে উল্লেখ করেছেন, "ফিহি সিফাউল্লিন্নাস।"[৬৭]

আশ্চার্যের বিষয়, মৌমাছিদের নেতা বা সম্রাজ্ঞীর বন্টনকৃত দলগুলো তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব অত্যন্ত তৎপরতার সাথে নিজ নিজ কর্তব্য পালনে নেতার আদেশ মনে-প্রাণে শিরোধার্য করে নেয়। যদি কোনো মৌমাছি আবর্জনার স্তূপে বসে যায় তবে তাদের বাসার দারোয়ান তাকে কোনো প্রকার ভেতরে প্রবেশ করতে দেয় না এবং সম্রাজ্ঞীর আদেশে তাকে হত্যা করে। কারণ মধুর উপর যেন কোনো প্রকার ময়লা না পড়ে।

মৌমাছিদের এই সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনা ও কর্মকুশলতা দেখে সত্যই বিস্ময়ে হতবাক হতে হয়।

আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন ওয়াহীর মাধ্যমে প্রদত্ত ঐ নির্দেশের যথাযত ফলশ্রুতি বর্ণনাও করেছেন। তিনি বলেন, "য়্যাখরুজু মিম বুতুনি... শেফা উল্লিন্নাস।"

অর্থাৎ- তার পেট থেকে বিভিন্ন রংয়ের পানীয় বের হয়। এতে মানুষের জন্যে রোগের প্রতিষেধক রয়েছে। খাদ্য ও ঋতুর বিভিন্নতার কারণে মধুর রং বিভিন্ন হয়ে থাকে। এ কারণেই কোনো বিশেষ অঞ্চলে কোনো বিশেষ ফল-মূলের প্রাচুর্য থাকলে সেই এলাকার মধুতে তার প্রভাব ও স্বাদ অবশ্যই প্রতিফলিত হয়। মধু সাধারণত তরল আকারে থাকে তাই একে পানীয় বলা হয়। এখানেও মহান আল্লাহর একত্ব ও অপার শক্তির অকাট্য প্রমাণ রয়েছে। একটি ছোট্ট প্রাণীর পেট থেকে কেমন উপাদেয় ও সুস্বাদু পানীয় বের হয়। অথচ প্রাণীটি কিন্তু আবার বিষাক্ত। বিষের মধ্যে এই বিষ প্রতিষেধক বাস্তবিকই সেই মহান আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের অপার শক্তির অভাবনীয় নিদর্শন নয় কি? এরপর সর্বশক্তিমান আশ্চার্যজনক কারিগরি দেখুন অন্যান্য দুধের যন্তুর দুধ ঋতু ও খাদ্যের পরিবর্তনে লাল ও হলদে হয় না। কিন্তু মৌমাছির মধু বিভিন্ন রংয়ের হয়ে থাকে।

মধুতে আছে মানুষের বিভিন্ন রোগের প্রতিষেধক

মূলত মধু একটি বলকারক ও রসনার জন্য আনন্দ ও তৃপ্তিদায়ক খাদ্য। অন্য দিকে রোগব্যাধির জন্যও অত্যন্ত ফলদায়ক ব্যবস্থাপত্র। কেনই বা হবে না, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার ভ্রাম্যমাণ মেশিনে সর্বপ্রকার ফল-ফুল থেকে সংগৃহীত বলকারক রস ও পবিত্র নির্যাস বের করে সুরক্ষিত গৃহে সঞ্চিত রাখে। যদি গাছ-গাছড়ার মধ্যে আরোগ্য লাভের উপাদান নিহিত থাকে। তবে এ সব নির্যাসের মধ্যে কেন থাকবে না? কফজনিত রোগে সরাসরি এবং অন্যান্য রোগে অন্যান্য উপাদানের সাথে মিশ্রিত হয়ে মধু ব্যবহৃত হয়। চিকিৎসকরা সালসা তৈরি করতে গিয়ে বিশেষভাবে একে অন্তর্ভুক্ত করেন। এর আরো একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, নিজে নষ্ট হয় না এবং অন্যান্য বস্তুকে দীর্ঘকাল পর্যন্ত নষ্ট হতে দেয় না। এ কারণেই হাজারো বছর ধরে চিকিৎসকরা একে (Alcohol) এর স্থলে ব্যবহার করে আসছেন।

মধুতে যে, মানুষের আরোগ্য হয় এ সম্পর্কে রাসূল (ﷺ) বলেছেন, তিনটি জিনিসের মধ্যে আরোগ্য রয়েছে। (১) শিংগা লাগানোতে, (২) মধুতে, (৩) আগুনের দ্বারা ছেঁকা দেওয়াতে। তবে আমি আমার উম্মতকে আগুনের দ্বারা ছেঁকা দেওয়া হতে নিষেধ করছি।[৬৮]

মধু যে, রোগের প্রতিষেধক এ সম্পর্কে হাদীসে একটি ঘটনাও উল্লেখ আছে। একদা এক পাতলা পায়খানা রোগী রাসূল (ﷺ)-এর নিকটে হাজির হয়ে পরামর্শ চাইলে তিনি মধু পান করার পরামর্শ দিলেন। কিন্তু মধু খেয়ে তার রোগ আরো বেড়ে গেল। *[২২ পৃষ্ঠায় দেখুন]*

[৬৭] *সূরা আন্ নাহ্ল।*

[৬৮] *সহীহুল বুখারী- হা. ৫৬৮৪।*

৬৬ বর্ষ ॥ ০১-০২ সংখ্যা ❖ ০৭ অক্টোবর- ২০২৪ ঈ. ❖ ০৩ রবিউস্ সানি- ১৪৪৬ হি.

বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় সালাফদের ভূমিকা

মূলঃ শায়খ ড. উসামাহ ইবনু আত্বায়া আল উতায়বী (হাফিযাহুল্লা-হ)

অনুবাদঃ মাহফুজুর রহমান ইবনু আব্দুস সাত্তার★

সমস্ত প্রশংসা বিশ্ব জাহানের প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলার তরে। দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর প্রতি, তাঁর পরিবার-পরিজন ও সকল সাথীবর্গের প্রতি।

পরকথা হলো, বর্তমান সময়ে "বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় সালাফদের ভূমিকা" বিষয়ে আলোচনা করা খুবই গুরুত্বের দাবিদার। কেননা আজ পুরো বিশ্ব দেখতে পাচ্ছে ফিলিস্তিনী মুসলিমদের উপর কাফিররা কী পরিমাণ অত্যাচার করছে। মুসলিমদের মাঝে কী পরিমাণ হত্যাযজ্ঞ চালাচ্ছে। অথচ এ কাফিররাই নাকি শান্তির ফেরিওয়ালা!

ইউক্রেনে যখন যুদ্ধ হলো, তাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো গুড়িয়ে দেয়া হলো তখন আমেরিকা ও ইউরোপের কাফিররা বলল, এ যুদ্ধ মোটেও ঠিক হচ্ছে না। এটা অন্যায়। পক্ষান্তরে যখন ফিলিস্তিনে যুদ্ধ হলো, তাদের ঘরবাড়ি গুড়িয়ে দেওয়া হলো, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো ভেঙে ফেলা হলো তখন তারাই আবার গলাবাজি করে বলল, এটা ইয়াহুদীদের অধিকার। এটা সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড নয়। তারা মূলত যুদ্ধ করছে নিজেদের দেশ থেকে শত্রু দূর করার জন্য!

রাশিয়া যখন ইউক্রেনে হামলা করল, তখন তা সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড হয়ে গেল কিন্তু ইয়াহুদীরা যখন ফিলিস্তিনের উপর হামলা করল তখন তা কিছুই নয়। তারা যুদ্ধ করছে নিজেদের রক্ষার জন্য। তারা যুদ্ধ করছে শত্রুদেরকে প্রতিরোধ করার জন্য! (মহান আল্লাহই সর্বোত্তম সহায়ক) তাই সালাফদের অনুসারী আহলে হাদীসদের উপর আবশ্যক হলো, বিশ্বে কোথায় কি হচ্ছে সে সম্পর্কে সচেতন থাকা, উদাসীন না থাকা।

ভারতের মির্জা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানীকে কারা সাহায্য করত? -সে নিজেকে মুসলিম হিসেবে দাবি করলেও সে মূলত মুসলিম ছিল না।- তাকে সাহায্য করত ব্রিটিশরা। কেন তারা তাকে এতো কাড়িকাড়ি টাকা দিয়ে সাহায্য করত? কি ছিল তাদের অভিপ্রায়? তারা তাকে সাহায্য করত মুসলিমদের মাঝে বিচ্ছিন্নতা তৈরি করার জন্য। মুসলিমদের মাঝে ফাটল সৃষ্টি করার জন্য। এ ব্রিটিশরাই ভারতে আহলে হাদীসদের বিরুদ্ধে দেওবন্দি তাবলীগ জামা'আতকে শক্তি যোগাত, তাদেরকে সাহায্য করত। কেন তারা তাদেরকে সাহায্য করত? তাদেরকে সাহায্য করত মুসলিমকে দলে দলে বিভক্ত করার জন্য।

ইরানে খুমেনীকে কারা সহায়তা যোগায়? বিপদে কারা তার পাশে দাঁড়িয়ে সাপোর্ট করে? তাকে সহায়তা করে ফ্রান্স ও ব্রিটেন। তারাই আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আহকে হত্যা করার জন্যে ইরানের শীআদেরকে সাহায্য করে।

রাশিয়ার বিরুদ্ধে উসামাহ্ ইবনু লাদেনের 'আল কায়েদা' সংস্থাকে আমেরিকা সম্পদ দিয়ে সহায়তা করল। তাকে অস্ত্র দিয়ে সহায়তা করল। তারপর তারাই ঘোষণা করল উসামাহ্ একজন প্রথম শ্রেণীর সন্ত্রাসী এবং তাকে হত্যা করল। তারাই তাকে রাশিয়ার বিরুদ্ধে তৈরি করল, তারাই তাকে শক্তি যোগাল পরে তারাই আবার তাকে হত্যা করল। এটা কি শান্তি? এটাই কি শান্তি প্রতিষ্ঠার নমূনা?

আইএসকে কারা সাহায্য করে? তারা কোথা থেকে আসল? ইরান আমেরিকা ইজরাইল মুসলিমদের জবেহ করার জন্যে তাদেরকে সাহায্য করে।

ইয়ামানের ছোট একটি দল হুসীকে আমেরিকা, ফ্রান্স ও ব্রিটেন কেন সাহায্য করে? তাদেরকে সাহায্য করে সৌদিতে অস্থিরতা তৈরি করার জন্য। ইয়ামান ও সৌদির আহলুল হাদীসদের মাঝে যুদ্ধ সৃষ্টি করার জন্য।

কাফিররা জোরগলায় দাবি করে বলে আমরাই শান্তিকামী! অথচ বাস্তব কথা হলো, তারাই ফিতনাবাজ, যুদ্ধবাজ ও বিপর্যয় সৃষ্টিকারী সন্ত্রাসী।

নিশ্চয় ইসলাম ধর্ম হলো শান্তির ধর্ম। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা-ই হলেন, শান্তিদাতা, নিরাপত্তা বিধায়ক, রক্ষক, পরাক্রমশালী, প্রবল, অতীব মহিমান্বিত। তিনিই মানুষদেরকে শান্তির নিবাসের দিকে আহ্বান করেন। তিনি যাকে ইচ্ছা সরল সঠিক পথের হিদায়েত দান করেন। আল্লাহ তা'আলা ইসলামকে শান্তির ধর্ম নামে অভিহিত করে বলেন,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱدْخُلُوا۟ فِى ٱلسِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا۟ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيْطَٰنِ ۚ إِنَّهُۥ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ﴾

★ *মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।*

"হে মু'মিনগণ! তোমরা পুর্ণাঙ্গভাবে 'শান্তি' তথা ইসলামে প্রবেশ করো এবং শয়তানের পদাঙ্কসমূহ অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।"[৬৯] রাসূল (ﷺ) বলেন,

الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ.

সে-ই প্রকৃত মুসলিম, যার জিহ্বা ও হাত হতে সকল মুসলিম নিরাপদ।[৭০] সুতরাং মুসলিমগণ তার অপর মুসলিম ভাইদের নিরাপত্তাদাতা এবং যারা শান্তি প্রতিষ্ঠায় কাজ করে তাদেরও নিরাপত্তা নিশ্চিতকারী। আল্লাহ বলেন,

﴿وَإِن جَنَحُوا۟ لِلسَّلْمِ فَٱجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ ۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ﴾

"আর তারা যদি সন্ধির দিকে ঝুঁকে পড়ে তবে আপনিও সন্ধির দিকে ঝুঁকবেন এবং আল্লাহর উপর নির্ভর করুন। নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।"[৭১]

সুতরাং মুসলিমদের দুর্বলতার সময় কাফিররা যদি শান্তিচুক্তি করতে চায় তাহলে আমরা তাদের সাথে শান্তিচুক্তিতে আবদ্ধ হব। তাদের জন্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করব। কিন্তু ইসলাম ও মুসলিমগণ যখন শক্তিশালী থাকবেন তখন তারা যদি শান্তিচুক্তি করতে চায় তবে আমরা বলব ইসলাম ছাড়া কোনো শান্তি নেই, নিরাপত্তা নেই। অথবা মুসলিমদের নিকট আত্মসমর্পণ করা ছাড়া কোনো নিরাপত্তা নেই। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَلَا تَهِنُوا۟ وَتَدْعُوٓا۟ إِلَى ٱلسَّلْمِ وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ وَٱللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَٰلَكُمْ﴾

"কাজেই তোমরা হীনবল হয়ো না এবং সন্ধির প্রস্তাব করো না যখন তোমরা প্রবল; আর আল্লাহ তোমাদের সঙ্গে আছেন এবং তিনি তোমাদের কর্মফল কখনো বিনষ্ট করবেন না।"[৭২]

সুতরাং বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় সালাফদের ভূমিকা কী?

বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় সালাফিদের সর্বপ্রথম ভূমিকা হলো, তারা মহান আল্লাহর তাওহীদ বাস্তবায়ন করেন এবং শির্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন।

[৬৯] *সূরা আল বাক্বারাহ: ২০৮।*
[৭০] *সহীহুল বুখারী- হা. ১০।*
[৭১] *সূরা আল আনফাল: ৬১।*
[৭২] *সূরা মুহাম্মাদ: ৩৫।*

সুতরাং হে আহলে হাদীসগণ! একনিষ্ঠভাবে তাওহীদের দিকে আহ্বানের প্রচেষ্টা করুন। "আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার অর্থে কোনো মা'বূদ নেই এবং মুহাম্মাদ (ﷺ) তার বান্দা ও রাসূল" এ বাণী প্রচারে নিজেকে বিলিয়ে দিন। শির্ক ও মুশরিকদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে চেষ্টা প্রচেষ্টা ব্যয় করুন।

তবে আমরা অবশ্যই বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় রাসূল (ﷺ)-এর পথনির্দেশনা অনুসরণ করব। তাঁর সুন্নাহ অনুসরণ করব। কেননা কিছু মানুষ শান্তি প্রতিষ্ঠার অজুহাত দিয়ে সমাজে আরো বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে, ইসলামে বিকৃতি সাধন করে। খারেজীদের চরমপন্থার দিকে মানুষকে আহ্বান করে এবং ইসলামকে লোক সমাজে এমনভাবে উপস্থাপন করে, যেন মনে হয় ইসলাম একটি সন্ত্রাসী ধর্ম। আবার কেউ কেউ রয়েছে দুমুখো সাপ, সুবিধাবাদী। মুশরিকদের সাথে বন্ধুত্ব রাখে, কাফিরদেরকে ভালোবাসে, ধর্ম স্বাধীনতা চায়, 'আক্বীদার ক্ষেত্রে শিথিলতা দেখায়। যেমন- ইখওয়ানুল মুসলিমিন বা জামা'আতে ইসলামী। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আহ হলেন মধ্যমপন্থী; সীমালঙ্ঘনকারীও নয় শিথিলতা প্রদর্শনকারীও নয়। যেমন- আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَٰكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا۟ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ﴾

"আর এভাবে আমরা তোমাদেরকে এক মধ্যপন্থী জাতিতে পরিণত করেছি, যাতে তোমরা মানবজাতির উপর সাক্ষী হও।"[৭৩]

দ্বিতীয় ভূমিকা হলো, তারা শরয়ী ইল্ম অর্জন করেন এবং তা প্রচারের মাধ্যমে মূর্খতা দূর করার কাজে নিয়োজিত থাকেন। ইল্মের দিকে মানুষকে আহ্বান করেন। -কেননা মুশরিক ও বিদআতিদের সবচে' বড় বৈশিষ্ট্য হলো, তারা শরয়ী ইল্ম সম্পর্কে অজ্ঞ। ইসলাম সম্পর্কে জাহেল। মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরি করেন। মাদ্রাসা ও আলেমদের সমর্থন করেন। তালেবুল ইল্মদেরকে সাপোর্ট করেন যেন তারা সমাজে উন্নতি করতে পারে। তাদের মাঝে সঠিক ইলম প্রচার করতে পারে। বিদআত ও শির্কের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেন। আলেমদেরকে সম্মান করেন, তাদেরকে মর্যাদা দেন; তবে তারা অতি সতর্ক থাকেন, এ সম্মান যেন তাদেরকে 'ইবাদত করার পর্যায়ে নিয়ে না যায়। অপাত্রে

[৭৩] *সূরা আল বাক্বারাহ: ১৪৩।*

কন্যাদানের মত না হয়ে যায়; বরং তারা অবলম্বন করেন মধ্যম পন্থা, তাদেরকে সম্মান করেন, মর্যাদা দেন তবে; তাদের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করেন না।

তৃতীয় ভূমিকা হলো, মুসলিম ও মুশরিকদের সাথে কৃত অঙ্গীকার ও চুক্তি রক্ষা করেন। চুক্তির ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলার শরিয়ত প্রয়োগ করেন এবং ইসলামী রাষ্ট্রে মুসলিম নেতাদের সাথে শরয়ী আচরণ করেন অর্থাৎ- যতক্ষণ না মহান আল্লাহর শরিয়ত বিরোধী কোনো নির্দেশ দেয় ততক্ষণ তাদের আনুগত্য করেন। তাদের জন্য দু'আ করেন আল্লাহ তা'আলা যেন তাদেরকে সঠিক বুঝ দান করেন ও সঠিক পথে পরিচালনা করেন।

পরিশেষে একটি প্রশ্ন, হে সালাফি ভাইয়েরা! আমরা কি ইয়াহুদীদের বিরুদ্ধে বিজয়ী হতে চাই না? হ্যাঁ, অবশ্যই চাই। তবে আল্লাহর এ বাণীটি স্মরণ রাখুন। তিনি বলেন,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِن تَنصُرُوا۟ ٱللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ﴾

হে মু'মিনগণ! যদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য করো, তবে তিনি তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং তোমাদের পাসমূহ সুদৃঢ় করবেন।"[৭৪]

"মহান আল্লাহকে সাহায্য করো" এর মর্মার্থ কি?

এর মর্মার্থ হলো, তাঁর শরিয়ত বাস্তবায়ন করো, তাঁর এককত্ব ঘোষণা করো, তাঁর রাসূলের সুন্নাতের অনুসরণ করো এবং সঠিক পন্থায় সংগ্রাম করো তাহলে আল্লাহ তা'আলা আপনাদেরকে সাহায্য করবেন।

হে আল্লাহ! আপনি ইয়াহুদীদের ধ্বংস করুন, তাদের সংখ্যাগুলো গণনা করে রাখুন, তাদের শক্তি নস্যাৎ করে দিন, তাদের কাউকেই ছাড় দিবেন না। হে আল্লাহ! আপনি ইয়াহুদীদের অপবিত্রতা থেকে মসজিদে আক্বসাকে মুক্ত করুন। ফিলিস্তিনকে ইয়াহুদীদের কবল থেকে রক্ষা করুন। হে আল্লাহ! স্পষ্ট হক্বের উপর মুসলিমদের ঐক্যবদ্ধ করুন। আমাদেরকে আপনার দীনের আনসার (সাহায্যকারী) হিসেবে কবুল করে নিন এবং মুসলিম অবস্থায় মৃত্যু দান করুন। আপনার সৎ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করে নিন। ওয়া সল্লাল্লাহু 'আলা নাবিয়্যিনা মুহাম্মাদ ওয়াল হামদু লিল্লাহি রব্বিল 'আলামিন। ☒

[৭৪] *সূরা মুহাম্মাদ: ৭।*

মৌমাছি মহান আল্লাহর একটি...

[১৯ পৃষ্ঠার পর]

তিনি দ্বিতীয়বার মধু পান করতে বললেন যাতে রোগীর পুরাতন মল বেরিয়ে যায়। এদিকে রোগীর বাড়ির লোকেরা ভাবল, রোগ তো বৃদ্ধিই পাচ্ছে। তাই পরদিন তার এক ভাইকে আবার নবী (ﷺ)-এর নিকটে পাঠালে রাসূল (ﷺ) বললেন,

আল্লাহ সত্য তোমার ভাই এর পেট মিথ্যা। যাও তাকে আবার মধু পান করাও। অতঃপর তৃতীয়বার মধু পান করালো ফলে সে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করলো।[৭৫]

আল্লাহ তা'আলার কথা কে সাহাবীরা এতটাই বিশ্বাস করতেন যে, একবার ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র শরীরে ফোঁড়া বের হলে তিনি ফোঁড়ার উপরে মধুর প্রলেপ দিয়ে চিকিৎসা করেন। সাহাবীরা এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, "আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজিদে কি মধু সম্পর্কে বলেননি।" "ফিহি সেফাউল্লিন্নাস।"[৭৬]

এ কারণেই 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে হাদীসে তিনি বলেন, "রাসূল (ﷺ) মধু এবং মিষ্টিদ্রব্য খুব বেশি ভালোবাসতেন।"[৭৭]

মৌমাছির আচরণ ও যোগাযোগের উপর গবেষণার জন্য ১৯৭৩ সালে নোবেল পান ডন-ফ্রিচ। কোনো নুতন বাগান বা ফুলের সন্ধান পাওয়ার পর একটি মৌমাছি আবার মৌচাকে ফিরে যায় এবং মৌমাছি নৃত্য নামক আচরণের মাধ্যমে তার সহকর্মী মৌমাছিদেরকে সেখানে খাওয়ার সঠিক গতিপথ ও মানচিত্র বলে দেয়। অন্যান্য শ্রমিক মৌমাছিকে তথ্য দেওয়ার লক্ষ্যে এ ধরনের আচরণ ও আলোকচিত্র প্রদর্শন করতে থাকে যেটি বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে। মূলত সমগ্র আইন-শৃংখলা একটি বড় রানী মৌমাছির হাতে থাকে এবং সেই হয় সকল মৌমাছির শাসক, সকলকেই তার কাছে জবাবদিহি করতে হয়।

এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, ছোট্ট এই প্রাণীটির মধ্যে বহু নিদর্শন রয়েছে সমগ্র চিন্তাশীল সমপ্রদায়ের জন্য। সুতরাং আমরা যদি এ ক্ষুদ্র প্রাণীটিকে নিয়ে একটু চিন্তা এবং গবেষণা করি তাহলে অনেক বিষয়ে শিক্ষা অর্জন করতে পারবো –ইন্শা-আল্লাহ। ☒

[৭৫] *সহীহুল বুখারী- হা. ৫৬৮৪; সহীহ মুসলিম- হা. ৪/১৭৩২।*
[৭৬] *কুরতুবী।*
[৭৭] *ফাতহুল বারী- ১০৮১; সহীহ মুসলিম- ২/১১০১।*

ক্বাসাসুল হাদীস

রাসূল (ﷺ)-এর দেখা এক স্বপ্নের বর্ণনা

–আবূ তাহসীন মুহাম্মদ*

সামুরাহ্ ইবনু জুনদুব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) প্রায়ই বলতেন, "কেউ কোনো স্বপ্ন দেখেছে কি?" অতঃপর আল্লাহ তা'আলা যাকে ইচ্ছা করতেন, তিনি তাঁর কাছে স্বপ্ন বর্ণনা করতেন। একদিন সকালে তিনি আমাদের বললেন, "আজ রাতে আমার কাছে দু'জন আগন্তুক এসেছিলেন, তাঁরা আমাকে জাগিয়ে তুলেন এবং বলেন, 'চলুন'। আমি তাঁদের সাথে যাই, এভাবে এক ব্যক্তির কাছে আসি, সে ব্যক্তি শুয়ে ছিল আরেকজন ব্যক্তি তার কাছে পাথর নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। সেই ব্যক্তি পাথর দিয়ে তার মাথায় আঘাত করে তার মাথা চূর্ণ করে দেন আর পাথরটি ছিঁটকে দূরে সরে যায়। অতঃপর তিনি পাথরের দিকে এগিয়ে যান এবং পাথর গ্রহণ করেন।

রাবীর ধারণা রাসূল (ﷺ) বলেছেন, তিনি তার কাছে ফিরে আসতেই তার মাথা আগের মতো ঠিক হয়ে যায়। অতঃপর তিনি তার সাথে প্রথম বারের মতোই আচরণ করেন।

রাসূল (ﷺ) বলেন, "আমি বললাম, সুবহানাল্লাহ! এরা কারা?" তারা আমাকে বলেন, "সামনে চলুন, সামনে চলুন।" রাসূল (ﷺ) বলেন, "অতঃপর আমি তাদের সাথে চললাম।

তারপর আমরা এক ব্যক্তির কাছে আসলাম যে মাথার পিছনের উপর চিৎ হয়ে শুয়ে আছে। তার কাছে আরেক ব্যক্তি হাতে লোহার কীলক নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। সে ব্যক্তি ঐ ব্যক্তির মুখের একপাশে আসেন অতঃপর তিনি তার চিবুক ঘাড়ের পশ্চাৎভাগ পর্যন্ত ফেঁড়ে ফেলেন, নাকের ছিদ্র ঘাড়ের পশ্চাৎভাগ পর্যন্ত ফেঁড়ে ফেলেন, তার চোখ ঘাড়ের পশ্চাৎভাগ পর্যন্ত ফেঁড়ে ফেলেন। তারপর তিনি অন্য পাশে যান এবং সেটার সাথেও তেমন করেন, যেমন প্রথম পাশের সাথে করেছিলেন। ঐ পাশে অনুরূপ করা শেষ হতেই প্রথম পাশ আগের মতো ভালো হয়ে যায়। তারপর তিনি আবার প্রথম পাশে যান এবং সেটার সাথে তেমন করেন, যেমন প্রথম বার করেছিলেন।

রাসূল (ﷺ) বলেন, "আমি বললাম, সুবহানাল্লাহ! এরা কারা?" তারা আমাকে বলেন, "সামনে চলুন, সামনে চলুন।" রাসূল (ﷺ) বলেন, অতঃপর আমি তাদের সাথে চললাম অতঃপর আমরা চুলার মতো একটা স্থাপনার কাছে আসলাম।

'আওফ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমার ধারণা রাসূল (ﷺ) বলেছেন, অতঃপর আমি সেখানে প্রচুর আওয়াজ ও হৈচৈ দেখতে পেলাম। আমরা সেখানে উঁকি দিলাম অতঃপর সেখানে অনেক বিবস্ত্র নারী-পুরুষ দেখতে পেলাম। আমরা আরো দেখলাম তাদের নিচে রয়েছে অগ্নী-নদী, যখন তাদের কাছে অগ্নী-শিখা আসে, তখন তারা চিৎকার করে কান্না করে।

রাসূল (ﷺ) বলেন, "আমি বললাম, সুবহানাল্লাহ! এরা কারা?"

তারা আমাকে বলেন, "সামনে চলুন, সামনে চলুন।"

রাসূল (ﷺ) বলেন, "অতঃপর আমি তাদের সাথে একটি নদীর কাছে আসলাম।" রাবী বলেন, "আমার ধারণা রাসূল (ﷺ) বলেছেন, "রক্তের মতো লাল নদী।" আমরা দেখলাম, নদীর মধ্যে একজন ব্যক্তি সাঁতার কাটছে আর নদীর কিনারায় এক ব্যক্তি তার কাছে অনেক পাথর জমা করে রেখেছেন। অতঃপর সাঁতার কাটা ব্যক্তি সাঁতার কাটতে কাটতে পাথর জমা করা ব্যক্তির কাছে আসে, অতঃপর সে তার মুখ খোলে আর কিনারার ব্যক্তি তার মুখে পাথর মারে।

রাসূল (ﷺ) বলেন, "আমি বললাম, সুবহানাল্লাহ! এরা কারা?"

তারা আমাকে বলেন, "সামনে চলুন, সামনে চলুন।"

রাসূল (ﷺ) বলেন, "অতঃপর আমরা বীভৎস চেহারার এক ব্যক্তির কাছে আসলাম যেমন তুমি সবচেয়ে বীভৎস চেহারার মানুষ দেখে থাকো। আমরা দেখলাম যে, সে ব্যক্তি আগুনের কাছে রয়েছে, সে আগুন জ্বালাচ্ছে এবং আগুনের পাশে ছুটাছুটি করছে।

রাসূল (ﷺ) বলেন, "আমি বললাম, এরা কারা?" তারা আমাকে বলেন, "সামনে চলুন, সামনে চলুন।"

---

* *আটমুল, শিবগঞ্জ, বগুড়া।*

রাসূল (ﷺ) বলেন, "অতঃপর আমরা একটা বাগানে আসলাম, যাতে বসন্ত কালের সব ধরনের ফুল ছিল। এতে আমরা দেখলাম বাগানের সামনে এতো লম্বা একজন ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আসেন, যে লম্বার কারণে আসমানের দিকে তাঁর মাথা আমি প্রায় দেখতেই পাচ্ছিলাম না! আমি দেখি সেই ব্যক্তির পাশে এতো বিপুল সংখ্যক ও এতো সুন্দর শিশুরা যে তা আমি আগে কখনো দেখিনি। রাসূল (ﷺ) বলেন, "আমি বললাম, এরা কারা?" তারা আমাকে বলেন, "চলুন, চলুন।"

রাসূল (ﷺ) বলেন, "অতঃপর আমরা এতো বিশাল এক বৃক্ষের কাছে আসলাম যে, এতো বড় ও সুন্দর বৃক্ষ আমি আর কখনোই দেখিনি! সাথীদ্বয় আমাকে বললেন, "আপনি এতে আরোহন করুন।"

রাসূল (ﷺ) বলেন, "অতঃপর আমরা তাতে আরোহন করলাম এবং আমরা একটি শহরে প্রবেশ করলাম যা স্বর্ণ ও রৌপ্যের ইট দ্বারা তৈরি ছিল। আমরা শহরের দরজার কাছে আসলাম এবং দরজা খুলে চাইলাম। অতঃপর আমাদের জন্য দরজা খুলে দেওয়া হয়। সেখানে আমরা দেখতে পাই এমন কিছু মানুষদের যাদের শরীরের একাংশ ছিল খুবই সুন্দর যেমন তুমি সবচেয়ে সুন্দর মানুষ দেখতে পাও আর অপর অংশ ছিল খুবই বিশ্রী যেমন তুমি সবচেয়ে খারাপ চেহারার মানুষ দেখতে পাও।

রাসূল (ﷺ) বলেন, "আমার সাথীদ্বয় তাদেরকে বললেন, "আপনারা যান এবং ঐ নদীতে ঝাঁপ দেন। সেখানে একটি নদী প্রবাহিত ছিল, তার পানি ছিল দুধের মতো সাদা। তারা সেখানে যান এবং নদীতে ঝাঁপ দেন তারপর তারা আবার ফিরে আসেন এমন অবস্থায় যে, তাদের চেহারার কুৎসিত অবস্থা দূর হয়ে যায় এবং তারা সর্বাধিক সুন্দর চেহারার অধিকারী হয়ে যান।"

রাসূল (ﷺ) বলেন, আমার সাথীদ্বয় আমাকে বললেন, এটি জান্নাতু 'আদন আর ঐটি আপনার বাসস্থান।

রাসূল (ﷺ) বলেন, আমি উপরে দৃষ্টি তুলে তাকালাম, অতঃপর আমি সাদা মেঘের ন্যায় প্রাসাদ দেখতে পেলাম। আমার সাথীদ্বয় আমাকে বললেন, ঐটি আপনার বাসস্থান।

রাসূল (ﷺ) বলেন, আমি বললাম, আল্লাহ আপনাদের বারাকাহ দান করুন, আপনারা আমাকে ছেড়ে দিন, আমি তাতে প্রবেশ করবো।

রাসূল (ﷺ) বলেন, "আমার সাথীদ্বয় আমাকে বললেন, এখন আপনি তাতে প্রবেশ করতে পারবেন না, তবে অবশ্যই আপনি তাতে (একদিন) প্রবেশ করবেন।"

রাসূল (ﷺ) বলেন, "আমি বললাম, আজ রাতে আমি অনেক বিস্ময়কর জিনিস দেখলাম, আমি যা দেখলাম, সেসবের মর্মার্থ কী?"

রাসূল (ﷺ) বলেন, "সাথীদ্বয় আমাকে বললেন, "অচিরেই আমরা আপনাকে তা জানাবো।

প্রথম ব্যক্তি, যার কাছে আপনি এসেছিলেন, যার মাথা পাথর দিয়ে আঘাত করা হচ্ছে, সে হলো ঐ ব্যক্তি যে কুরআন শিক্ষা করে অতঃপর কুরআন পরিত্যাগ করে এবং ফর্‌য সালাত আদায় না করে ঘুমিয়ে থাকে। আর যে ব্যক্তির কাছে আপনি এসেছিলেন, যার চিবুক মাথার পশ্চাৎভাগ পর্যন্ত ফেড়ে ফেলা হচ্ছে, চোখ চিবুক মাথার পশ্চাৎভাগ পর্যন্ত ফেড়ে ফেলা হচ্ছে, নাকের ছিদ্র চিবুক মাথার পশ্চাৎভাগ পর্যন্ত ফেড়ে ফেলা হচ্ছে, সে হচ্ছে এমন ব্যক্তি যে সকালে বাড়ি থেকে বের হয়ে গিয়ে মিথ্যা কথা বলে, অতঃপর তা দিকদিগন্তে পৌঁছে যায়।

চুলা সদৃশ স্থাপনায় বিবস্ত্র যেসব নারী-পুরুষদের দেখেছেন, এরা হলো ব্যভিচারী নর ও নারী।

যে ব্যক্তি নদীতে আছে, যাকে পাথর নিক্ষেপ করা হচ্ছে গলাধঃকরণ করার জন্য সে হলো সুদখোর। আগুনের কাছে কুৎসিত চেহারার ব্যক্তি, যিনি আগুন জ্বালাচ্ছিলেন, তিনি হলেন জাহান্নামের রক্ষী ফেরেশ্‌তা মালিক।

বাগানে যে লম্বা ব্যক্তিকে দেখেছেন, তিনি হলেন ইব্‌রা-হীম (আলাইহিস সালাম)। তাঁর পাশের শিশুরা হলো সেসব শিশু, যারা ফিতরাত তথা ইসলামের উপর জন্ম গ্রহণ করেছে (অতঃপর বালেগ হওয়ার আগে মারা গিয়েছে)।

রাবী বলেন, "অতঃপর একজন মুসলিম ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ), মুশরিকদের সন্তানরাও?" রাসূল (ﷺ) বলেন, "মুশরিকদের সন্তানরাও।"

আর যেসব ব্যক্তির দেহের একাংশ সুন্দর ছিল আর অপরাংশ ছিল কুৎসিত, তারা হলো এমন ব্যক্তি যারা ভালো-মন্দ মিশ্রিত 'আমল করেছে অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাদের ক্ষমা করে দেন।"[৭৮]

[৭৮] *মুসনাদ আহমাদ- ৫/৮-৯; সহীহুল বুখারী- হা. ৭০৪৭; তাবারানী আল কাবীর- হা. ৬৯৮৪; শারহুস্ সুন্নাহ- বাগাবী, হা. ২০৫৩; সহীহ মুসলিম- হা. ২২৭৫; জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ২২৯৫; সুনানু বাইহাক্বী- ২/১৮৭।*

বিশেষ মাসায়িল

অহেতুক চিন্তার কারণে সালাতে মনোযোগ নষ্ট হয়: করণীয় কী?

“রাসূল (ﷺ) তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তা গ্রহণ করো, আর যা কিছু নিষেধ করেছেন তা বর্জন করো।” *(সূরা আল হাশ্‌র: ৭)*

আরাফাত ডেস্ক: মানুষের মন দ্রুত পরিবর্তনশীল। এ মন কখনোই দীর্ঘ সময় স্থির থাকে না। তাই সালাতের মধ্যে অন্য মনস্ক হওয়া, মনোযোগ অন্যত্র চলে যাওয়া, দুনিয়াবি নানা প্রকার অহেতুক চিন্তার উদ্রেক হওয়া অস্বাভাবিক নয়। এমনটি হতে পারে ইমামের কিংবা মুক্তাদির; জামা'আত অথবা একাকী; সর্বাবস্থায় সকলের ক্ষেত্রে হতে পারে।

এ ক্ষেত্রে করণীয় হলো, তৎক্ষণাৎ পুনরায় সালাতে মনোযোগ ফিরিয়ে আনতে হবে। চিন্তা করতে হবে, মহান আল্লাহকে আমি দেখছি অথবা আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই আমাকে দেখছেন। তিনি আমার কথা শুনছেন, আমি তার সাথে চুপিসারে কথা বলছি।

পাশাপাশি সালাতে পঠিত কিরাআত, দু'আ-তাসবিহ ইত্যাদি অর্থগুলোর প্রতি মনোযোগ দিতে হবে, মৃত্যুর কথা স্মরণ করতে হবে। এ ভাবে মনোযোগ ধরে রাখার চেষ্টা করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা তৌফিক দান করুন।

সর্বদা মনে রাখতে হবে, ভয়ভীতি ও বিনয়-নম্রতা সহকারে স্থিরচিত্তে সালাত আদায় করা মু'মিনের চূড়ান্ত সাফল্যের সোপান। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ○ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾

“মু'মিনগণ সফলকাম হয়ে গেছে; যারা ভয়ভীতি সহকারে বিনম্রচিত্তে সালাত আদায় করে।”[৭৯]

সালাতরত অবস্থায় অন্তরে বিনয়-নম্রতা ও ভয়ভীতি সৃষ্টি এবং মন স্থির রাখার উপায়গুলো হলো–

১) সালাতের প্রস্তুতি নিয়ে প্রশান্ত মনে আগেভাগে মাসজিদে গমন করা।

২) সালাতে মৃত্যুর কথা বেশি বেশি স্মরণ করা।

আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন :

اذكرِ الموتَ في صلاتِك، فإنّ الرجلَ إذا ذَكر الموتَ في صلاتِه لحريٌّ أن يُحسنَ صلاتَه.

“সালাতে মৃত্যুর কথা স্মরণ করো। কেননা মানুষ যখন সালাতে মৃত্যুর কথা স্মরণ করে তখন সে তার সালাতকে সুন্দরভাবে আদায় করতে সক্ষম হয়।”[৮০]

৩) “আমি মহান আল্লাহকে দেখছি অথবা তিনি আমাকে অবশ্যই দেখছেন” এই অনুভূতি মনে জাগ্রত রাখা।

৪) এ কথা স্মরণ করা যে, সালাতে বান্দা যা বলে, আল্লাহ তা'আলা তার প্রতিউত্তর করে থাকেন।

৫) এ কথা স্মরণ রাখা যে, সালাতে মূলতঃ মহান আল্লাহর সাথে চুপিসারে কথা বলা হয়।

৬) সালাতে পঠিত দু'আ-তাসবীহ ও সূরা-কিরাআতের অর্থ অনুধাবন করা।

৭) খাবার উপস্থিত রেখে বা পেশাব-পায়খানা চেপে সালাত আদায় না করা। কেননা এতে মনোযোগ বিঘ্নিত হয়।

৮) সাজদায় বেশি বেশি মহান আল্লাহর নিকট দু'আ করা।

রাসূল (ﷺ) বলেছেন :

«أَقْرَبُ مَا يَكُوْنُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ، وَهُوَ سَاجِدٌ، فَأَكْثِرُوْا الدُّعَاءَ».

“বান্দা যখন সাজদায় থাকে তখন সে আল্লাহ তা'আলার সবচেয়ে সন্নিকটে থাকে। অতএব, তোমরা (সাজদাহ্ অবস্থায়) অধিক পরিমাণে দু'আ করো।”[৮১]

তবে একাকী সালাত, নফল সালাত, সুন্নাত, তাহাজ্জুদ ইত্যাদি ক্ষেত্রে সাজদায় অধিক পরিমাণে দু'আ করা ভালো। কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত দু'আসমূহ অধিক হারে পড়ার চেষ্টা করতে হবে।

৯) হাই আসলে মুখে হাত দিয়ে যথাসম্ভব তা প্রতিরোধ করার চেষ্টা করা। *[৪০ পৃষ্ঠায় দেখুন]*

[৭৯] *সূরা আল মু'মিনূন: ১-২।*

[৮০] *সিলসিলাহ্ সহীহাহ্- হা. ২৮৩৯,সনদ হাসান।*

[৮১] *সহীহ মুসলিম- হা. ২১৫/৪৮২।*

নিভৃত ভাবনা

দলীয় শাসনের বীভৎস দুঃশাসন ও আশান্বিত প্রত্যাশার প্রস্তাবনা

-মোহাম্মদ মাযহারুল ইসলাম*

হতভাগা এ জাতির ভাগ্যকাশ! সুখ, শান্তি, নিরাপত্তা, স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য যে জাতি ব্রিটিশ বেনিয়াদের বিরুদ্ধে অবস্থান করে নিজের ন্যায্য অধিকার কে ছিনিয়ে নিলো ঠিক সেই সময়ের পালাবদলে আবার সেই হতভাগা জাতি শোষণের সম্মুখীন হলো। ১৯৪৭ সালের ১৪ ও ১৫ আগস্ট পাকিস্তান ও ভারত বিভক্ত হয়। স্বাধীনতার নিশানা উড়ায় দু'টি দেশ। ইতিহাসের ঘটনা প্রবাহ বলছে। পাকিস্তানের সাথে যুক্ত হয় পূর্ব বাংলা তথা বর্তমানের বাংলাদেশ। মূলতঃ পূর্ব বাংলা পাকিস্তানের সাথে যুক্ত হওয়ার কারণ ছিল তৎকালীন দুর্নীতিপরায়ণ শাসকবর্গের সীমাহীন দুর্নীতি, স্বৈরশাসন আর বিভিন্ন ধরনের অবিচার থেকে মুক্তি লাভের আশায়। যখন শাসকদের শোষণের সীমানা সহ্য করার মতো পর্যায় অতিক্রম করল এবং জনতার পিঠ দেয়ালে ঠেকে। তখন বিক্ষুব্ধ জনতা তথা পূর্ব বাংলার বিশাল সংখ্যক জনতা তাঁদের বিরুদ্ধে অবস্থান করল এবং তাদের দুঃশাসনের যাঁতাকল থেকে মুক্তি লাভের মহিমায় রক্তের রাজপথে নেমে পড়ল। ফলে দীর্ঘ সংগ্রাম, ত্যাগ তিতিক্ষার সহস্র ঋণে অর্জিত হলো আজকের বাংলাদেশ। যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে ক্ষমতার পালাবদল হলো। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার মোহে পড়ে ব্রিটিশ বেনিয়াদের সেই নির্মম সহিংসতা নির্যাতন আর অধিকার চর্চা কে দলীয় শাসনের বেড়াজালে আবদ্ধ করতে শুরু করল। ১৯৯৬ সালে আওয়ামী সরকার নতুন রূপে ক্ষমতায় আসে শাসনের তরে দেশ গড়তে। পাঁচ বছরের সময় সীমা। অভাব অনটন আর অভাবনীয় কষ্টের সন্ধিক্ষণে মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা তখনও পূরণ হয়নি। সেই সময়েই নির্বাচন। আওয়ামী প্রার্থী শেখ হাসিনা। নির্বাচনের আগ মুহূর্তে কান্না জড়িত কণ্ঠে জনতার উদ্দেশ্যে বলল: আজ আমি পিতৃহারা ও পরিবার হারা! এক অসহায় কন্যা। আপনাদের সামনে দাঁড়িয়েছি একটি মাত্র দাবি নিয়ে। আপনারা অন্ততঃ আমার দলকে একটিবার ভোট দিয়ে দেখুন, দেখবেন দেশের অবস্থা পাল্টে যাবে! নির্বাচনের আগে কত চমকপ্রদ কথা শুনিয়ে জাতি কে আকর্ষণ করল। অথচ নির্বাচনে শেখ হাসিনাকে মনোনীত করার পর দেশের উন্নতি, স্বাধীনতা ছাড়াও সবকিছুই মারাত্মক ব্যত্যয় ঘটল। দল-মত নির্বিশেষে সকলের উপরে অন্যায় অত্যাচারের স্ট্রিম রোলার চালানো হলো; সন্ত্রাসী চাঁদাবাজিসহ বিভিন্ন সেক্টরে যেন অন্যায় অবিচারের প্রতিযোগিতা শুরু হলো রাজনৈতিক হর্তাকর্তাদের। দলীয় শাসনের দুঃশাসক হিসেবে আবির্ভাব হলো দলীয় ক্যাডার এমপি, মন্ত্রীদের। সুদ ঘুষসহ দেশের প্রত্যেকটি শিক্ষাঙ্গনে দখলদারি দলীয় নোংরা রাজনীতির অনুপ্রবেশ ঘটানো এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকসহ রাজনৈতিক দলে অংশগ্রহণ করার জন্য বিভিন্ন কেন্দ্রিকভাবে বল প্রয়োগ ভয়-ভীতি ত্রাস সৃষ্টি করল। সময়ের ব্যবধানে পরবর্তীতে আবার যখন আওয়ামী সরকার দেশের ক্ষমতায় আসল। তখন থেকে দৃশ্য পটের বীভৎস পরিবর্তন নজরে আসল। তারা দেশের আয় উন্নতির দিকে তেমন মনোনিবেশ না করে নির্মমভাবে হত্যা কান্ডের অভিলাষ চালালো সেই সকল বিডিআর সৈনিকদের যারা দেশ প্রেমে সোচ্চার ছিল। ভারতীয় দাদা বাবুদের স্বার্থ উদ্ধারে মারাত্মক হুমকির সম্মুখীন হওয়ায় আওয়ামী সরকার খুনি হাসিনা তাঁদের মধ্যে পারস্পরিক অন্তকলহ সৃষ্টি করে ফলে বিডিআর দের মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষ ও লোমহর্ষক হত্যাযজ্ঞ ঘটে যা আজও আমাদেরকে ব্যথিত করে। এটি ছিল পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে ঘৃণিত কর্মকাণ্ড যা নিজ দেশের সরকারের অধীনে ছত্রছায়ায় যুদ্ধ লাগিয়ে তামাশা করার নামান্তর। ঠিক তখন থেকেই আওয়ামী সরকার বেপরোয়া হওয়া শুরু করে। যে বা যারাই তাদের দল-মত বিরুদ্ধে অবস্থান করল এবং তাদের ন্যায্য পাওনা অধিকারকে সমুন্নত করা স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষার ক্ষেত্রে তাদের প্রচেষ্টা দাবি-দাওয়া কে ন্যায্য পন্থায় পাওয়ার ক্ষেত্রে দাবি উপস্থাপন করল তখন তাদেরকে চিহ্নিত করে আওয়ামী সরকার শেখ হাসিনার দলবলেরা তাদেরকে গুম, হত্যা, ছাড়াও তাদের সম্পত্তি

* *শিক্ষক, হোসেনপুর দারুল হুদা সালাফিয়্যাহ মাদ্‌রাসা, খানসামা, দিনাজপুর।*

কে বাজেয়াপ্ত করল। রাজনৈতিক আদর্শগত দিক থেকে আওয়ামী সরকার মুক্তিযুদ্ধ কেন্দ্রিকভাবে তাদের রাজনৈতিক দর্শনকে জোরালোভাবে ফোকাস করল এবং তারা রাজনৈতিক আদর্শগত মডেল অনুপ্রেরণার উৎস হিসেবে গ্রহণ করল শেখ মুজিবুর রহমানকে। মুক্তিযুদ্ধ কে তারা আদর্শের মূলমন্ত্রণ হিসেবে গ্রহণ করল এবং সেইসাথে ইসলামকে তারা পর্যায়ক্রমে মাইনাস করতে শুরু করল। তাদের দৃষ্টিভঙ্গি চালচলন এবং সবা সেমিনার আলোচনা সভা সকল ক্ষেত্রেই মুক্তিযুদ্ধকেই আদর্শগত মানদণ্ড হিসেবে উপস্থাপন করতে শুরু করলো এবং সেই সাথে এই মুক্তিযুদ্ধের আদর্শিক সৈনিক প্রভু,অনুসরণীয় ব্যক্তি হিসেবে গ্রহণ করল শেখ মুজিবুর রহমানকে। তারা এত বেশি চাটুকারিতা এবং অন্ধভক্তে পরিণত হয়ে গেছিল যে শেখ মুজিবুর রহমানকে জাতির পিতা বলতেও কোনো প্রকার কুণ্ঠাবোধ করল না। এভাবেই তারা তাদের দীর্ঘমেয়াদী শাসনব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠিত করলো এবং ভারতকে তাদের প্রভু হিসেবে গ্রহণ করল কেননা ভারত আওয়ামী সরকারকে শাসন ব্যবস্থায় প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য যত ধরনের সুযোগ-সুবিধা এবং যত ধরনের রাজনৈতিক কূটনৈতিক কৌশল সব ক্ষেত্রে তারা তাদেরকে সহায়তা করতে এবং তাদেরকে সেভাবে পদ পদবীতে বহাল রাখার জন্য বড় ধরনের ভূমিকা পালন করেছে। ফলে যত ধরনের অন্যায় অবিচার দুর্নীতি সীমাহীন সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড প্রত্যেকটি সেক্টরে তারা তাদের নোংরা অভিলাষ কে প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে পিছনের দিকে ফিরে তাকাননি। যে বা যারা যখনই তাদের স্বার্থের বিরুদ্ধে অবস্থান করেছে নিজের ন্যায্য অধিকারকে বৈধ পন্থায় প্রতিষ্ঠা করার জন্য কথা বলেছে ঠিক তখনই তারা তাদেরকে গুম হত্যা করেছে এবং তাদের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান গ্রহণ করে তাদেরকে তাদের গোলাম হিসেবে বানিয়ে রেখেছে। যার কারণেই দেখা গেছে রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ অঢেল সম্পদের মালিক হয়েছে বিদেশে বাড়ি গাড়ি করার মতো সুযোগ সুবিধা পেয়েছে এবং বিশাল সম্পদের পাহাড় তৈরি করে তারা দেশে বুক ফুলিয়ে চলেছে এবং তারা মানুষের উপর এত সীমাহীন নির্যাতন, নিষ্পেশনের ভয়াবহ লোমহর্ষক ঘটনার সৃষ্টি করেছে যেটাকে এখন বলা হচ্ছে আয়না ঘর। দীর্ঘ সময়ের ভোট বিহীন অবৈধ স্বৈরাচারী খুনি শাসক হাসিনা এমন কাজ করতে সাহস পেয়েছে মূলতঃ দীর্ঘ সময়ে শাসন ক্ষমতার থাকার কারণে। দলীয় শাসনের বীভৎস দুঃশাসন মূলত এভাবে প্রত্যেক যুগেই জুলুমের বিভীষিকার বীভৎস দৃশ্যপটগুলো পরিস্ফুটিত হয়েছে এবং জাতির সামনে তাদের মুখোশ উন্মোচন হয়েছে। হাজার হাজার মানুষের রক্তের রাজপথকে যেভাবে তারা রঞ্জিত করেছে এবং মানুষের ন্যায্য অধিকারকে যেভাবে খর্ব করেছে যার সর্বশেষ ফলাফল হিসেবে তাদের ভাগ্য আকাশে এভাবেই করুন জিল্লতির পরিণাম ডেকে এনেছে।

ঘটনা প্রবাহের দিকে একটু ফিরে দেখা যাক জোট সরকারের দলীয় শাসনের দুঃশাসন। স্বৈরাচারী আওয়ামী সরকার আমলে যত ধরনের দুর্নীতি, চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ছাড়াও যে ধরনের অপকর্ম ছড়িয়েছে তা রুখে দেয়ার জন্য জোট সরকারের নেতৃত্বে দেশের মানুষের আয় উন্নতি, অর্থনৈতিক নিরাপত্তা, মানুষের সুন্দর, সুখের জীবন গড়ার এবং তার নিরাপত্তার স্বার্থে তৈরি করে RAB বাহিনী। দেশের শান্তি সমৃদ্ধি, নিরাপত্তা নিশ্চিত করার চেষ্টা চালানোর পরও নেতৃত্বের পর্যায়ে রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ বিভিন্ন স্তরে নানা প্রকার দুর্নীতির সাথে জড়িত হয় এবং তাঁদের নিজের উদর পূর্তি করে। ব্যাংক ব্যালেন্স, বাড়ি, গাড়ি ছাড়াও তাঁরা রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি দখল করে নিজেদের কে আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ বানায়। সর্বোচ্চ স্তর থেকে নিম্ন স্তর পর্যন্ত প্রায় সকল সেক্টরে দুর্নীতি প্রবেশ করে। যদিও জোট সরকারের সাফল্যের প্রশংসনীয় ইতিবাচক দিকও আছে। কিন্তু সমস্যা হলো দলীয় মোড়কে শাসন ক্ষমতা যে কোনো রাজনৈতিক ব্যক্তিকে অন্ধ করে তোলে এবং রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে নেতা নেত্রীকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে চরম বিশ্বাসের পর্যায়ে স্থান দেয় ফলে তাদের ভুল আর চোখে পড়ে না; বরং সব কিছুই সঠিক মনে করে দলীয় শাসন ব্যবস্থায় রাজনৈতিক মতাদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করতে উঠে পড়ে লাগে। এই জোট সরকারের আমলে সারাদেশে বোমা ফুটার মহড়া হয়। উন্নতি! উন্নতি বলে জোরে জোরে বক্তব্য দেয় আর তাদের অন্ধ ভক্তরা নেতা নেত্রীর যিক্‌র করে। কি অদ্ভুত বাস্তবতা?(!)। নির্বাচনের আগে এসে জনতাকে মায়া কান্নায় ভাসিয়ে বলে– আমরা ক্ষমতায় আসলে দুর্নীতি দমন করবো। উন্নয়নের জোয়ারে ভাসাবো। এমন শত প্রতিশ্রুতি দেয় ক্ষমতাসীন দলেরা। বাস্তবে দেখা যাচ্ছে যে যত মায়া কান্না, অভিনয় আর বড় গলায় মাইকে বক্তব্য দিয়ে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে সে এখন

তত বড় বাটপার, বেঈমান, প্রতারক আর দুর্নীতিবাজ। চরম বাস্তবতা আমাদের নিকট অতীতে বিদ্যমান।

জোট সরকার ও আওয়ামী সরকারের দেশ শাসনের সাদৃশ্য বৈসাদৃশ্যঃ আওয়ামী সরকারের দেশ শাসনের পিছনে পিছন থেকে সকল প্রকার সাহায্য, সহযোগিতা, কূটনৈতিক কৌশল ছাড়াও বিভিন্ন ক্ষেত্রে ছায়ার মতো লেগে ছিল ভারত। নামকাওয়াস্তে শাসনের গদিতে বসিয়ে রেখেছিল আওয়ামী সরকারকে। আর পিছন থেকে কলকব্জা নাড়ায় ভারত। যেটা আজ সকলের কাছেই স্পষ্ট। আওয়ামী সরকারের রাজনৈতিক মতাদর্শ, দৃষ্টি ভঙ্গি এবং সবচেয়ে বড় চেতনার উৎস হিসেবে গ্রহণ করেছিল মুক্তিযুদ্ধ। আদর্শিক নেতা হিসেবে গ্রহণ করেছিল শেখ মুজিবুর রহমানকে। যে বা যারাই তাদের বিরুদ্ধে কথা বলত তারা তাকেই মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী, রাজাকার, জঙ্গি বলে আখ্যায়িত করে শিকল বন্দী করত। ফলে তাদের মতাদর্শের বিপরীত হলেই জেলখানায় আটক, গুম, হত্যা ছাড়াও কত যে অপরাধের সাথে জড়িত হয়ে পাশবিক নির্যাতন করেছে তা এখন সকলের কাছে স্পষ্ট। আওয়ামী সরকার ভারতকে প্রভু হিসেবে গ্রহণ করেছিল। যার কারণে ভারত ভক্তি ছিল তুঙ্গে। আওয়ামী সরকারের ব্যর্থতার একটি দিক ছিল যে তারা দীর্ঘ মেয়াদি অবৈধ শাসন ব্যবস্থায় টিকে থাকার সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছিল এবং গণহারে হত্যা কাণ্ড করেছিল। বিশেষ করে ভারতের মদতে আলেম সমাজের উপর নির্মম পাশবিকতার শিকার হয়ে রাতের অন্ধকারে শাপলা চত্বরের যে ট্রাজেডি তা স্মরণ করলে আজও গায়ের লোম খাড়া হয়ে যায়। এমন গণহত্যার নজির পৃথিবীর ইতিহাসে নেই। তাঁদের এই শাসনের ব্যর্থতার এবং শাসন ক্ষমতায় বেপরোয়া, উদ্যত হওয়া আর ইসলামের উপর আক্রমণ করার রেকর্ড অন্য কোনো সরকার ব্যবস্থায় হয়নি যেটা আওয়ামী সরকার দলীয় শাসনের বীভৎস দুঃশাসন দেখিয়েছে।

ঠিক তেমনি ভাবে যদি বলা যায় তাহলে জোট সরকারের আমলে এত বেশি চিত্র না দেখলেও দেখতে পাবেন তাঁদের শাসন ব্যবস্থায় রাজনৈতিক মতাদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে– বাংলাদেশ জিন্দাবাদ। রাজনৈতিক মতাদর্শ আদর্শিক নেতা হিসেবে চোখ বন্ধ করে সর্বোচ্চ সম্মান জ্ঞাপন করে জিয়াউর রহমানকে। তাঁদের শাসন ব্যবস্থায় যৌথভাবে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী প্রত্যক্ষভাবে হোক বা পরোক্ষভাবে হোক সাহায্য সহযোগিতা করে। আওয়ামী সরকার যেভাবে মুক্তিযুদ্ধ কেন্দ্রিকভাবে রাজনীতি করে, জঙ্গি, জঙ্গি বলে আখ্যায়িত করে তারা ঠিক তেমন না করলেও জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে কেউ অবস্থান করলে তারা তার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করে। জোট সরকার ক্ষমতায় দীর্ঘ দিন টিকে থাকার অভিলাষকে জিইয়ে রাখার জন্য এমন নোংরা রাজনীতির অধ্যায় রচনা করে। একাধারে তারাও ক্ষমতায় বসে থাকে। যেটা তাদের সূচনায় পরবর্তীতে আওয়ামী সরকার দীর্ঘ ১৫ বছরে হাড়ভাঙা জবাব দেয়। তারাও দেশের বিভিন্ন স্থানে বোমা হামলার মতো ঘটনা ঘটায়।

প্রত্যাশিত প্রত্যাশার প্রস্তাবনাঃ

১) দল মত নির্বিশেষে সকল প্রার্থীকে দেশ ও জনগণের স্বার্থে কল্যাণ কামনা করা এবং নির্বাচনের আগের প্রতিশ্রুতি আদায় করা।

২) সকল স্তরের মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং সকল সেক্টরের দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান এবং তাঁদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়া।

৩) দলের ভক্তিকে পরোয়া না করে গৌণ করে দেখে উচ্চ পর্যায়ের দায়িত্বশীল তথা এমপি মন্ত্রীদের মধ্যেও যদি কেউ দুর্নীতির বিরুদ্ধে অভিযোগে অভিযুক্ত হয় তাহলে তাদের পদ, আসন বাতিল সাব্যস্ত করা।

৪) যোগ্য মেধাবীদের যোগ্যতা বিবেচনা উপযুক্ত দায়িত্ব অর্পণ করা এবং তাঁদের ন্যায্য পাওনা আদায়ের অধিকারকে নিশ্চিত করা।

৫) দেশের সকল পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের লেজুড়বৃত্তি ছাত্র শিক্ষক নোংরা রাজনীতি চর্চা বন্ধ করা এবং এক্ষেত্রে সকলের পারস্পরিক সম্পর্ক সৌহার্দ্র পূর্ণ আচরণ অটুট রাখার সংস্কৃতি চর্চা করা।

৬) আলেম সমাজের যথাযথ হক্ব আদায় করা, তাঁদের উপর যুল্‌ম নির্যাতন রোধ করা এবং তাঁদের জেল থেকে মুক্তি দেয়া আর সেইসাথে তাঁদের সর্ব প্রকার অধিকার কে সুনিশ্চিত করা।

৭) দেশের সকল প্রকার অনৈতিক কর্মকাণ্ড, রাষ্ট্রের স্থীতিশীলতা নষ্ট হয় এমন সকল কাজ প্রতিহত করা।

৮) সমাজ নষ্ট করে যেমন- মদ, জুয়া, পতিতাবৃত্তি, অশ্লীল সিনেমা, বিদেশি অপসংস্কৃতি কে বন্ধ করা এবং তাঁদের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান গ্রহণ করা।

৯) ইসলামী শরিয়াহভিত্তিক আইন ব্যবস্থাকে কার্যকরী হিসেবে বাস্তবায়ন করা এবং সকলের মাঝে ইসলামী শরিয়তের মৌলিক উদ্দেশ্যকে পরিস্ফুটিত করতে দৃষ্টি আকর্ষণ করা। ☒

বিশেষ প্রতিবেদন

NTRCA'র দুর্নীতি: নিবন্ধনধারীদের জীবন দুর্বিষহ! প্রধান উপদেষ্টার হস্তক্ষেপ জরুরি

–মো. আব্দুল মোমেন*

"শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড" আর এ শিক্ষাকে জাতির কাছে প্রেজেনটেশন করেন একজন শিক্ষক। তাই শিক্ষককে বলা হয় মানুষ গড়ার কারিগর। এ শিক্ষক যদি অযোগ্য হয়– তাহলে মানুষ হবে অমানুষ, আর জাতি হবে মেরুদণ্ডহীন। তাই উন্নত জাতি ও আদর্শ মানুষ গড়তে যোগ্য শিক্ষক নিয়োগের বিকল্প নেই। শিক্ষক নিয়োগে স্বজনপ্রীতি, দুর্নীতি ও আর্থিক লেন-দেন কোনো সভ্যসমাজে স্বীকৃতি পায় না। তাই শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে এ সব অনিয়ম ও অর্থের বিনিময়ে অযোগ্যপ্রার্থীকে পদায়ন বন্ধ করতে হবে। এজন্য ২০০৫ সালে তৎকালীন সরকার বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কতৃপক্ষ (এনটিআরসিএ) গঠন করে। হয়রানি, দুর্নীতি ও নিয়োগ বাণিজ্য বন্ধ করার জন্য যে প্রতিষ্ঠানের জন্ম; তিক্ত হলেও সত্য সে প্রতিষ্ঠান নিজেই এখন হয়রানি, দুর্নীতি ও লুটপাটের আখড়ায় পরিণত হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে ভুয়া সনদ বিক্রি, প্রশ্নপত্র ফাঁস, ঘুষের বিনিময়ে চাকরি প্রদান, শূন্য পদ রেখেও পদায়ন না করা, বদলির ব্যবস্থা না রেখে নিবন্ধনধারীদের সাথে ইনডেক্সধারীদেরও আবেদন গ্রহণ, শূন্যপদের বিপরীতে বহু প্রতিষ্ঠানে একজন প্রার্থী থেকে পৃথক পৃথক আবেদনের জন্য আবেদন ফি গ্রহণ ও গণবিজ্ঞপ্তি প্রকাশে কালক্ষেপণের অভিযোগ রয়েছে। উল্লেখ্য যে, এ পর্যন্ত নিয়োগ পরীক্ষা হয়েছে ১৮টি আর নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি হয়েছে মাত্র পাঁচটি। এনটিআরসিএ নিবন্ধিত ১ম-১২তম নিয়োগ প্রত্যাশী শিক্ষক পরিষদ ও এনটিআরসিএ নিবন্ধিত নিয়োগ বঞ্চিত শিক্ষক ফোরাম দাবি করেছে, ১ম-১২তমদের রোল, রেজিস্ট্রেশন নম্বর ব্যবহার করে এনটিআরসিএ'র কতিপয় অসাধু কর্মকতা-কর্মচারী নগদ অর্থের বিনিময়ে ভুয়া সনদ বিক্রি করেছে। একেকটি সনদের বিপরীতে সর্বনিম্ন এক লাখ টাকা থেকে শুরু করে পাঁচ লাখ টাকা পর্যন্ত তারা নিয়েছে। দৈনিক দেশ রূপান্তর পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদে উঠে এসেছে এনটিআরসিএ'র ১২ হাজার টাকা সরকারি বেতনে চাকরিরত ড্রাইবার মো. জিয়াউর রহমান সেখানে চাকরির সুবাদে অল্পদিনেই কোটিপতির বনে গিয়েছে। মালিক হয়েছে ৫০ কোটি টাকার। সে ২ লাখ টাকায় সনদ ও ৬ লাখ টাকায় নিয়োগ পাইয়ে দিত। এনটিআরসিএ'কে টাকা দিলেই মিলতো স্বাক্ষর, বাড়িয়ে নেওয়া যেতো নম্বর। এসব চিত্র গণমাধ্যমে প্রকাশ পেলেও কোনো ব্যবস্থা নেয়নি কর্তৃপক্ষ। এনটিআরসিএ'র সাবেক চেয়ারম্যান জনাব এনামুল কাদের খান জানিয়েছেন, ৬০ হাজারের বেশি জাল সনদধারী চাকরি পেয়েছে। এ বিষয়ে সকল তথ্য-উপাত্ত ঘাঁটাঘাঁটি করে পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর (ডিআইএ) জানিয়েছে, ২০১৪-১৫ অর্থবছরের হিসাব মতে, সারাদেশে মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও স্নাতক স্তরে প্রায় ৬০ হাজার শিক্ষক এখনো জাল সনদে শিক্ষকতা করছে। সে বছরের প্রথম পাঁচ মাসেই ২৬৮ শিক্ষকের সনদ জাল বলে তদন্তে ধরাও পড়েছে। সম্প্রতি ডিআইএ থেকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে জাল সনদ সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন পাঠানো হয়। এই প্রতিবেদনে ১ হাজার ১৫৬ জন শিক্ষকের জাল সনদের তথ্য দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে ৭৯৩ জন শিক্ষকের নিবন্ধন সনদ জাল। এখনো ৫৮ হাজার ৫৪৪ জন জাল সনদধারী শিক্ষক বহাল তবিয়তে চাকরি করে যাচ্ছে। তাদের বিরুদ্ধে কোনো অ্যাকশন নেওয়া হচ্ছে

* *কেন্দ্রীয় সমন্বয়ক, NTRCA নিবন্ধিত ১ম-১২তম নিয়োগ প্রত্যাশী শিক্ষক পরিষদ।*

না। বিচারের মুখোমুখি করা হচ্ছে না এনটিআরসিএ'র ঐ সকল অসাধু কর্মকর্তা-কর্মচারীদের, যারা জাল সনদ প্রদানের সাথে সম্পৃক্ত। অভিযোগ রয়েছে তারা শূন্য পদের বিপরীতে গণবিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করলেও নিয়োগ সুপারিশ না করে শূন্যপদ শূন্যই রেখে দেয়। তৃতীয় গণবিজ্ঞপ্তিতে ৩৪ হাজার শূন্য পদের বিপরীতে আবেদনের প্রেক্ষিতে (ইনডেক্সধারী ছাড়া) নিয়োগ সুপারিশ করা হয় মাত্র ১২ হাজারের। ২২ হাজার পদ শূন্যই থেকে যাচ্ছে, পদায়ন হচ্ছে না, প্রতিষ্ঠান পাচ্ছে না শিক্ষক, নিবন্ধনধারীরা পাচ্ছে না চাকরি, শূন্যপদ শূন্যই থাকছে। এছাড়া আরো রয়েছে এনটিআরসিএ'র সিস্টেম দুর্নীতি। এনটিআরসিএ'র প্রতিটি সিস্টেম বা নিয়মই যেন এক একটি প্রতারণার ফাঁদ। তাদের বিরুদ্ধে বৈধ সনদধারীদের বঞ্চিত করে জাল সনদধারীদের টিকিয়ে রাখতে নতুন নতুন নিয়ম করার অভিযোগও রয়েছে। তাদের সিস্টেম দুর্নীতি আর এসব নিয়মের মারপ্যাঁচের কারণে কোনো কোনো বৈধ নিবন্ধনধারী একবারের জন্যও আবেদন করার সুযোগ পায়নি। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক চতুর্থ নিবন্ধনধারী ইসলাম শিক্ষা বিষয়ের প্রভাষক পদে একজন চাকরি প্রত্যাশী জানায়। তিনি ২০০৮ সালে কলেজ পর্যায়ে নিবন্ধন পরীক্ষা দিয়ে সনদ অর্জন করেছেন। তখন এনটিআরসিএ আরবি ও ইসলাম শিক্ষা বিষয়কে একত্রিত করে পরীক্ষা নিয়েছে। কিন্তু মেধাতালিকা করার সময়ে তারা তাদের ইচ্ছেমত আরবি ও ইসলাম শিক্ষা বিষয়কে পৃথক পৃথক করে মেধাতালিকা প্রণয়ন করে। যার কারণে ইসলাম শিক্ষা বিষয়ে নিবন্ধন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েও মেধাতালিকায় তার নাম এসেছে আরবি বিষয়ে। মেধাতালিকায় অন্য বিষয়ে নাম অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কারণে ৩য় গণবিজ্ঞপ্তি পর্যন্ত সনদের মেয়াদ ও ৩৫ (পঁয়ত্রিশ) উর্ধ্ব বয়সের প্রার্থীদের আবেদনের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও সে তার বিষয়ের প্রেক্ষিতে কোনো প্রতিষ্ঠানে আবেদন করার সুযোগ পায়নি।

এমন পরিস্থিতিতে বাধ্য হয়েই অনেক ভুক্তভোগী প্যানেল প্রত্যাশী নিবন্ধিত শিক্ষক সংগঠন নামের একটি ব্যানারে আন্দোলনে যায়। ৫ জুন ২০২২ ইং থেকে ২১ ডিসেম্বর পর্যন্ত রোদ-বৃষ্টি এমনকি পবিত্র ঈদের মতো মহা উৎসবকেও উপেক্ষা করে কাফনের কাপড় জড়িয়ে ২০০দিন শাহবাগে সকাল-সন্ধ্যা আন্দোলন করে। তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপুমনির সাথে আলোচনার টেবিলে এনটিআরসিএ'র দুর্নীতির বিষয়টিও তারা তুলে ধরেন। তিনি তার হীন স্বার্থ চরিতার্থ করতে ভুক্তভোগীদের বিপরীতেই অবস্থান নেন। তার সেই হীন স্বার্থ জাতির সামনে উন্মোচিত হয় গত ২৬ আগস্ট ২০২৪, সোমবার দৈনিক মানবজমিন পত্রিকায় "দীপু মনির ঘুষের সম্রাজ্য" শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদের মাধ্যমে। দীপু মনির পর শিক্ষামন্ত্রী ব্যারিস্টার মহিবুল হাসান চৌধুরী নওফেল মহান জাতীয় সংসদে (শূন্যপদ ৯৭ হাজারের মধ্যে ১৯ হাজার শিক্ষকের নিয়োগ কার্যক্রম চলমান রেখে) গত ৬ মাসে ৯৯ হাজার শিক্ষক নিয়োগ দিয়েছেন বলে উল্লেখ করেছেন। এটা হয় জাতির সঙ্গে মহান সংসদে দাঁড়িয়ে তার নির্লজ্জ মিথ্যাচার, না হয় গোপনে অর্থের বিনিময়ে নিজেদের দলীয় ক্যাডার ও অযোগ্য লোকদের নিয়োগের সুস্পষ্ট বার্তা। বঞ্চিতদের নিয়োগের আশ্বাস দিয়ে মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব সরোজ কুমার নাথ প্যানেল প্রত্যাশী নিবন্ধিত শিক্ষক সংগঠনের কাছ থেকে নিয়োগ বঞ্চিতদের ২১ হাজার ৭৯৬ জনের একটি তালিকাও গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তিনিও তাদেরকে মিথ্যা আশ্বাসই দিয়েছিলেন। এ সকল কারণেই এনটিআরসিএ'র বিরুদ্ধে অনেকে মামলা করেছেন। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, এখন পর্যন্ত এনটিআরসিএ'র বিরুদ্ধে ৫১৬টি মামলা সুপ্রিম কোর্টে দায়ের করা হয়। এর মধ্যে রিট মামলার সংখ্যা ৪৮৭টি এবং কন্টেম্পট মামলার সংখ্যা ২৯টি। এর মধ্যে ২৫৪টি মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে। মামলা চলমান রয়েছে ২৬২টি। নিষ্পত্তি হওয়া মামলাগুলোর মধ্যে হাইকোর্ট বিভাগ থেকে নিষ্পত্তি হয়েছে ২৩২টি। আর

আপিল বিভাগ থেকে নিষ্পত্তি মামলার সংখ্যা ২২টি। চলমান মামলাগুলোর মধ্যে হাইকোর্টে রয়েছে ২৫৪টি। আর আপিল বিভাগে ৮টি। এনটিআরসিএ'র মতো এত অল্প সময়ে কোনো সরকারি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কোথাও কখনো এত মামলা-মোকাদ্দমা হয়নি। এনটিআরসিএ'র এ সব কার্যকলাপ দেখে মনে হচ্ছে প্রতিষ্ঠানটি শিক্ষক নিয়োগ দানের জন্য নয়; বরং নিবন্ধিতদের সাথে প্রতারণা ও আইনের মারপ্যাঁচে তাদের নিয়োগ বঞ্চিত রেখে অবৈধ ব্যবসার পথকে আরো দীর্ঘায়িত করার জন্যই কাজ করে যাচ্ছে। এসব নানা কারণে ও নিয়োগপ্রাপ্তদের হয়রানি রোধে এনটিআরসিএ'কে তুলে দিতেও মত দিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। সিদ্ধান্ত মতে, সরকারি কর্ম কমিশনের (পিএসসি) আদলে বেসরকারি শিক্ষকদের নিয়োগ দিতে নতুন কমিশন গঠন করা হবে। এ বিষয়ে সে সময়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় একটি খসড়া আইন তৈরির নির্দেশও দেয়। এনটিআরসিএ বিলুপ্ত করে বেসরকারি শিক্ষক নির্বাচন কমিশন (এনটিএসসি) গড়ে তুলতে প্রস্তাব করা হয়। দুর্নীতিবাজদের উৎখাত না করে প্রতিষ্ঠানের নাম পরিবর্তন করলে নিবন্ধনধারীদের কোনো উপকার হবে না বলে মনে করেন সাধারণ নিবন্ধনধারীগণ। বিগত স্বৈরশাসকের তেলবাজ ও পদলেহনকারী আমলারা অসাধুচক্রের সঙ্গে মিলে-মিশে প্রভাবশালী রাজনৈতিক ব্যক্তির ছত্রছায়ায় রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে মহামান্য রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশ "(১) এর (i) উপ-বিধি ও মহামন্য হাইকোর্ট বিভাগের ১৩৯/২০১৯নং রিট পিটিশন ও ৫৪/২০২২ রিভিউ রায় উপেক্ষা করে ১ম-১২তম নিবন্ধনধারীদের নিয়োগ ও নিয়োগের সুযোগ না দিয়ে ৪র্থ ও ৫ম গণবিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে যা সম্পূর্ণরূপে বেআইনি। ৫ অগাস্টের গণঅভ্যুত্থানে অর্জিত এই বৈষম্যহীন বাংলাদেশেও তারা তাদের অবৈধ আয়ের পথকে উন্মুক্ত এবং জাল সনদধারীদের টিকিয়ে রাখতে ১ম-১২তমদের জন্য নিয়োগের আর কোনো সুযোগ রাখতে চাচ্ছে না। নিয়োগ বঞ্চিত ও প্যানেল প্রত্যাশী নিবন্ধনধারীগণ বৈষম্য বিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত অর্ন্তবর্তীকালীন সরকারের উপদেষ্টাগণের দ্বারে দ্বারে ঘুরেও কোনো আশার বাণী শুনতে পাচ্ছেন না। উপদেষ্টাগণের কার্যালয়েও মনে হচ্ছে এনটিআরসিএ'র দুর্নীতিবাজদের মদদ দানের আমলা ও তাদের নিকট থেকে অবৈধ অর্থের সুবিধাভোগী দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা-কর্মচারী রয়েছে। সাম্য ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে হলে তাদের সকল ফাঁদ ধ্বংস করে অসাধু কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সমূলে উপড়ে ফেলতে হবে। ফ্যাসিস্ট সরকারের তল্পিবাহক অবৈধ ও দোষী বিচারকদের পক্ষপাতদুষ্ট সকল আইনি কর্মকাণ্ডকে রদ-রহিত করে দ্রুততম সময়ে নিবন্ধনধারীদের সকল রিট-মামলা নিস্পত্তি করতে হবে। অসহায় বেকার নিবন্ধনধারীদেরকে আদালতপাড়া থেকে প্রতিষ্ঠানে ফিরিয়ে নিতে হবে। এই অসহায় নিবন্ধনধারীদের দুর্বিষহ জীবনের দুঃখ-কষ্ট উপলব্ধি করে সকল বৈষম্যের অবসান ঘটিয়ে তাদের নিয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে। জাল সনদধারীদের পদচ্যুত করে সে পদগুলো শূন্য করতে হবে। প্রশ্ন ফাঁস হওয়া ১৮তম নিবন্ধন পরীক্ষা বাতিল করতে হবে। তারপরেও শূন্য পদের ঘাটতি থাকলে নিয়োগ প্রত্যাশী নিবন্ধনধারীদের নিয়োগ না দেয়া পর্যন্ত আর কোনো নিবন্ধন পরীক্ষা নেয়া যাবে না। এতে শুধু হয়রানি, দুর্নীতি ও বেকার নিবন্ধনধারীদের সংখ্যাই বৃদ্ধি পাবে যা বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠায় বাঁধা হয়ে দাঁড়াবে। শিক্ষাখাতে দুর্নীতি দূরীকরণে এবং সাম্য ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় এনটিআরসিএ'র উপর মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা মহোদয়ের হস্তক্ষেপ খুবই জরুরি। নিয়োগ বঞ্চিত অসহায় শিক্ষক সমাজ মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে প্রধান উপদেষ্টার কঠোর হস্তক্ষেপই পারবে এনটিআরসিএ'র দুর্নীতি রোধ করতে এবং যোগ্যতার সকল শর্তে উত্তীর্ণ ১ম-১২তম নিয়োগ বঞ্চিত নিবন্ধনধারীদের প্যানেল অনুসারে দ্রুত নিয়োগের ব্যবস্থা করতে। ☒

কিশোর ভুবন

ছোটদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ (ﷺ)

সংকলনেঃ হাফেয মুহাম্মাদ আইয়ূব বিন ইদু মিয়া*

ভূমিকাঃ আল্লাহ তা'আলা বলেন, "তোমাদের জন্য রয়েছে উত্তম নমুনা, সুন্দরতম আদর্শ রাসূলুল্লাহর জীবনের মাঝে।"[৮২]

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেনঃ "তোমাদের কেউই ঈমানদার হবে না যতক্ষণ আমি তার কাছে তার পিতা, সন্তান ও সকল মানুষ হতে প্রিয়তম না হই।"[৮৩]

বিশ্বনবী মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর জীবন চরিত যদিও অতি সংক্ষেপে তুলে ধরা সম্ভব নয় তবুও বর্তমান সময়ে মানুষ নানা কাজে ব্যস্ত এবং বই পাঠে অনাগ্রহ, তাই এই সকল লোকেদের জন্যই প্রিয় নবী (ﷺ)-এর জীবনী সম্পর্কিত মৌলিক কিছু তথ্য তুলে ধরতেই এই সংকলন। মহানবী (ﷺ)-এর বিশাল জীবনী যা মহাসমুদ্রের মতো, তাই প্রত্যেক মুসলিমের এ সম্পর্কে জ্ঞান রাখা জরুরি। কেননা প্রিয় নবী (ﷺ)-এর আদর্শ জীবনের সর্বক্ষেত্রে অনুসরণ ব্যতীত মানব জাতির কল্যাণ নেই। তাই আসুন না! আমরা এ প্রতিজ্ঞা করি, জীবনে একবার হলেও বিশ্বনবী (ﷺ)-এর সম্পূর্ণ জীবনী গ্রন্থ পড়ি এবং নিজের জীবনেও অনুসরণের চেষ্টা করি।

তৎকালীন 'আরবদের ধর্ম বিশ্বাসঃ মুসলিম জাতির পিতা ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম)-এর পুত্র ইসমা'ঈল (আলাইহিস সালাম)-এর দা'ওয়াত ও তাবলীগের ফলে 'আরবের সাধারণ মানুষ দীনে ইব্রাহীমীর অনুসারী ছিল। তাই তারা একমাত্র আল্লাহর 'ইবাদত করত এবং তাওহীদ বা এককত্বের বিশ্বাসী ছিল, কিন্তু যতই দিন যেতে লাগল তারা দীনের শিক্ষা ততই ভুলে যেতে থাকল। তবুও তাদের মধ্যে তাওহীদের আলো এবং ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাম)-এর দীনের কিছু নিদর্শন অবশিষ্ট ছিল। এর পরে 'আরবদের মধ্যে মূর্তিপূজার সূচনা করেন সর্দার 'আম্র ইবনু লুহাই। যাকে তৎকালীন নেতৃস্থানীয়রা ধর্মীয় বিশেষজ্ঞ মনে করতেন। এই 'আম্র ইবনু লুহাই একদিন সিরিয়া সফরকালে দেখলেন সেখানকার মানুষেরা মূর্তি পূজা করছে। তিনিও ভাবলেন এটা ভালো কাজ। কেননা সিরিয়ায় অনেক নবীর আবির্ভাব হয়েছে এবং আসমানি কিতাব নাযিল হয়েছে। কাজেই সিরিয়ার জনগণ যা করছে তা ভালো ও পুণ্যের কাজ মনে করে সিরিয়ার হুব্‌ল নামক মূর্তিকে নিয়ে এসে কাবা ঘরে স্থাপন করে। মাক্কার লোকেরা তার ডাকে সাড়া দেয়। মাক্কাবাসীকে মূর্তিপূজা করতে দেখে হিজাযবাসী তাদের পদাংক অনুসরণ করে চলে। কেননা মাক্কার লোকেরা ছিল কাবা ঘরের রক্ষণাবেক্ষণকারী এবং হেরেমের বাসিন্দা। এমনি করে 'আরবে মূর্তিপূজার সূচনা হয়।

প্রিয়নবীর বংশঃ ইসমা'ঈল (আলাইহিস সালাম)-এর সময়কাল ছিল খ্রিষ্টপূর্ব প্রায় দু হাজার বছর আগে। কুরাইশরা ছিল নির্ভেজাল ইসমা'ঈলী বংশোদ্ভূত 'আরব এবং অন্যান্য ইসমা'ঈলীদের সরদার। তাই মানবতার মুক্তির দূত মুহাম্মাদ (ﷺ) ছিলেন ইসমা'ঈল (আলাইহিস সালাম)-এর বংশের।

'আরব দেশের বিশেষত্বঃ 'আরব ছিল দুনিয়ায় মধ্যস্থল। 'আরবী ভাষার বিশেষত্ব গুণ ছিল। 'আরবরা ছিল সকল পরাশক্তি থেকে মুক্ত, স্বাধীন ও দুর্ধর্ষ যোদ্ধাজাতি। তাদের কাণ্ডজ্ঞান, বিবেক-বুদ্ধি ও মেধা-প্রতিভা ছিল উন্নতমানের। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কথাও তারা অতি সহজে উপলব্ধি করতে পারত। তারা ছিলেন উদারপ্রাণ, স্বাবলম্বী ও আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন জাতি। তাদের স্মরণশক্তি ছিল দুনিয়ায় অতুলনীয়। তারা ছিলেন মরুভূমির কঠিন জীবনযাপনে বাস্তববাদী মানুষ।

অন্ধকার যুগ (আইয়্যামে জাহিলিয়্যাত)ঃ প্রিয় নবী (ﷺ)-এর নুবুওয়াতের পূর্বের যুগ ছিল অন্ধকার যুগ। তৎকালীন মানুষ পরস্পরে খুন-খারাবি, মেয়েদের জীবন্ত কবর দেয়া, জুয়া খেলা ও মদ্যপানের ছড়াছড়ি, সুদের সয়লাব, মূর্তি, পাথর, নক্ষত্র ও জিন্-পরীর পূজা করত।

বিশ্ব নবী (ﷺ)-এর জন্ম ও শিশুকালঃ পৃথিবীর মধ্যস্থান পাহাড় ঘেরা বিরাণ ভূমি কা'বাঘর অবস্থিত মাক্কায়। তৎকালীন সময়ের সম্মানিত ও উঁচু বংশ

---

* *সভাপতি, আহলে হাদীস লাইব্রেরি ঢাকা।*

[৮২] *সূরা আল আহ্যা-ব: ২১।*

[৮৩] *সহীহুল বুখারী- হা. ১৫; সহীহ মুসলিম- হা. ১৭৮।*

কুরাইশদের সন্তান কা'বার মুতাওয়াল্লীর পুত্র 'আব্দুল্ল-হ ও মা আমিনার সন্তান বিশ্বনবী মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর জন্ম হয় বিশুদ্ধ সূত্র মতে ৯ই রবী'উল আওয়াল সোমবার ৫৭১ 'ঈসায়ী ২ অথবা ২২ এপ্রিল। প্রিয় নবী (ﷺ)-এর জন্মের পূর্বেই পিতা মারা যান। জন্মের পর মক্কা থেকে দূরে সুস্বাস্থ্য ও মজবুত গঠনের জন্য নির্মল গ্রাম্য পরিবেশে শিশুকাল অতিবাহিত হয় দুধ মা হালিমার তত্ত্বাবধানে। ৬ বছর বয়সের সময় মা জননীও মৃত্যুবরণ করেন। প্রিয় নবী (ﷺ)-এর বয়স যখন ৩-৫ বছর, একদিন জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম) তাঁকে শুইয়ে বুক চিরে দিল বের করে তা থেকে রক্তপিণ্ড বের করে বললেন, এটা আপনার মাঝে শয়তানের অংশ। এরপর হৃৎপিন্ড একটি তশতরিতে রেখে যমযম কূপের পানি দিয়ে ধুয়ে তারপর যথাস্থানে স্থাপন করেন।

বিশ্বনবী (ﷺ)-এর কিশোর ও যৌবনকাল: বিশ্বনবী (ﷺ)-এর কিশোর ও যৌবনকাল কাটে বড় চাচা আবূ ত্বালিব-এর নিকটে। জীবনের সূচনা থেকে তাঁর অসাধারণ গুণ ও নিদর্শনাবলী লক্ষ্য করা যায়। কিশোরকাল থেকেই তিনি সব ধরনের পাপাচারমুক্ত ও সৎজীবনযাপন করতেন। জীবনে কখনো মদপান করেননি। কোনো অসামাজিক কার্যকলাপ গান-বাজনা, পূজা পার্বণ বা অসৎ কাজে শামিল হতেন না। নবী হওয়ার পূর্বেই নির্মল চরিত্র ও শ্রেষ্ঠত্বের গুণ ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন মুহাম্মাদ (ﷺ)। সততা ও আমানাতদারীর জন্য 'আরব ভূমিতে তিনি 'আল-আমীন' বলে পরিচিত ছিলেন। ১৫ বছর বয়সে ফুজ্জার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। এ যুদ্ধ কুরাইশ ও ক্বায়স গোত্রের মধ্যে হয়। যুদ্ধে অংশ নিলেও তিনি কারো ওপর আঘাত করেননি। কাবা ঘর পুনর্নির্মাণে অংশগ্রহণ করেন এবং হাজারে আসওয়াদে পাথর স্থাপন নিয়ে গোত্রসমূহের বিবাদে আশু রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ এড়িয়ে প্রজ্ঞাপূর্ণ সমাধান দিয়ে এর মীমাংসা করেন। যৌবনকালে তৎকালীন সামাজিক অন্ধকার অবস্থা থেকে পরিত্রাণের জন্য তিনি 'হিলফুল ফুযুল' নামক সংগঠন করেন। ছোটবেলা থেকেই তিনি ছিলেন অত্যন্ত ভদ্র, সৎ ও লজ্জাশীল।

প্রিয় নবী মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর ব্যবসা ও কর্ম জীবন: চাচা আবূ ত্বালিব-এর সাথে ব্যবসার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেশে সফর করেন। প্রিয় নবী (ﷺ)-এর আমানাতদারী ও সততার জন্য তৎকালীন ব্যবসায়ী খাদীজাতুল কুবরা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তাঁকে ব্যবসায়িক কাজে নিযুক্ত করেন। এতে প্রিয় নবী (ﷺ) অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেন। কিছুকাল তিনি রাখালও ছিলেন, যেমন অন্যান্য নবীগণও ছিলেন।

আদর্শ নেতা মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর বিবাহ ও সন্তানাদি: ৪০ বছর বয়সী খাদীজাতুল কুবরা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর সাথে ২৫ বছরের যুবক মুহাম্মাদ (ﷺ) বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। উল্লেখ্য খাদীজাতুল কুবরা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর মৃত্যুর পরে প্রিয় নবী (ﷺ)-এর আরো দশজন স্ত্রী ছিলেন। তবে রাসূল (ﷺ)-এর এই প্রথম স্ত্রীর ঘরে ইব্রাহীম ব্যতীত যেসব সন্তান জন্মেছিল- উম্মু কুলসূম, যায়নাব, রুক্বাইয়াহ্, ফাত্বিমাহ্, 'আব্দুল্ল-হ ও আবূ ত্বাইয়্যাব। উল্লেখ্য, পুত্রগণ ছোটবেলাই মৃত্যুবরণ করেন।

প্রিয় নবী (ﷺ)-এর হেরা গুহায় ধ্যান: তৎকালীন 'আরবের লোকেদের পূজা ও অন্যান্য পাপাচার দেখে তাঁর মন ব্যথীত হয়ে উঠল। তাই তিনি মক্কা বায়তুল্লাহ থেকে ৩ মাইল দূরে খাদ্য-পানীয় নিয়ে উঁচু পাহাড়ের গুহায় (হেরার গুহায়) একাকি 'ইবাদাতে ও ধ্যানে মগ্ন থাকতেন। কখনো উম্মাহাতুল মুসলিমীন খাদীজাহ্ কষ্ট করে দুর্গম এই পাহাড়ে খাবার পৌঁছে দিতেন।

স্বামীর জন্য নিবেদিত প্রাণ ও প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী এই মহীয়সী মহিলা কুবরা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) আল্লাহর রাস্তায় অকাতরে অর্থ ব্যয় করে ইতিহাসে বিরল সম্মানের অধিকারী হয়ে আছেন।

প্রিয় নবী (ﷺ)-এর নুবুওয়াতী জীবন ও তাওহীদ প্রচার: মুহাম্মাদ (ﷺ) ৪০ বছর বয়সে নবুওয়াত প্রাপ্ত হন অর্থাৎ- মাক্কার অদূরে উঁচু পাহাড়ে হেরা গুহায় ধ্যানরত অবস্থায় তাঁর ওপর আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল হয় প্রথম ওয়াহী। জিবরীল (আলাইহিস সালাম) তাঁকে নবী হিসেবে বলেন, "পড়, তোমার রবের নামে, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।" এরপর শুরু হয় নুবুওয়্যাতী জীবন। মানব জাতির নিকট তাওহীদের বাণী প্রচারে নিয়োজিত হন, প্রথম তিনটি বছর তাওহীদের দা'ওয়াত দান খুবই গোপনে ও কাছের লোকেদের নিকট সীমাবদ্ধ থাকে। তাঁর ডাকে প্রথমেই সাড়া দেন

স্ত্রী খাদীজাতুল কুবরা (রাযিয়াল্লাহু আনহা), বন্ধু আবূ বাক্র সিদ্দীক্ব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ও কিশোর 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)। এরপরে শামিল হতে থাকে সত্য অনুসন্ধানীরা। এরই ধারাবাহিকতায় তৎকালীন দুই বীর আমির হামযাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ও 'উমার ফারূক (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর ইসলাম গ্রহণ মুসলিমদের সাহস ও শক্তি বৃদ্ধি পায়, শুরু হয় প্রকাশ্যে দীন প্রচার। পরবর্তী ৭টি বছর কাফিরদের চরম যুল্ম ও নির্যাতন বৃদ্ধির পাশাপাশি ইসলামের দা'ওয়াতের কাজও দুর্বার গতিতে চলতে থাকে। কুরাইশদের প্রভাবশালী নেতা আবূ ত্বালিব-এর মৃত্যুতে প্রিয় নবী (ﷺ) চাচার আশ্রয় ও স্নেহ থেকে বঞ্চিত হন। প্রিয় নবী (ﷺ)-সহ মুসলিমদের ওপর চরমভাবে বৃদ্ধি পায় হত্যা, নির্যাতন, অবরোধ, দেশত্যাগ, বিবাহ-বিচ্ছেদসহ নানা যুল্ম।

মাক্কার বাইরে (ত্বায়িফে) ইসলামের দা'ওয়াত: নবী (ﷺ) মক্কা থেকে ৬০ মাইল দূরে অবস্থিত পর্বত উঁচু এলাকায় পায়ে হেঁটে ত্বায়িফে ১০ দিন ইসলামের দা'ওয়াত দেন নেতৃস্থানীয় লোকেদের। কিন্তু সবাই তাকে বললেন, এখান থেকে বেড়িয়ে যাও। শুধু তাই নয়, তারা প্রিয় নবী (ﷺ)-এর ওপর লেলিয়ে দেন লোকজনদের। যাদের অমানবিক নির্যাতনে প্রিয় নবী (ﷺ) রক্তাক্ত হয়ে বেহুঁশ হয়ে যান। তবুও তিনি দ্বীনের দা'ওয়াত দিতেই থাকেন এবং মাযলূম অবস্থায়ও সেখানে তাদের জন্য বদদু'আ না করে হিদায়াতের জন্য আল্লাহর দরবারে দু'আ করেন। এরপর জিন্দের একটি দল ইসলাম গ্রহণ করেন।

মু'জিযা (অলৌকিকতা) প্রকাশ: প্রত্যেক নবীদেরই মু'জিযা ছিল এবং তা উম্মাতের সামনে প্রকাশও পেয়েছে। তেমনি বিশ্বনবী মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর অনেকগুলো মু'জিযা ছিল। যেমন ১) অক্ষর জ্ঞানহীন হওয়া সত্ত্বেও তাঁর ওপর নাযিল হয় মানবতার মুক্তির সানাদ মহাগ্রন্থ আল-কুরআন, ২) নবী (ﷺ) কাফিরদের তার মু'জিযাস্বরূপ চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত করে দেখান, ৩) একদিন রাতে মি'রাজে (ঊর্ধ্বগমন/সাত আসমানে) যান। ঐদিন সেখানে জান্নাত জাহান্নাম দর্শনসহ বিভিন্ন নবীদের সাথে সাক্ষাৎ ও কথা হয় এবং উম্মাতে মুহাম্মাদীর জন্য পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফর্য হয় এ রকম অসংখ্য ঘটনা ঘটেছে যা সবই তিনি অবলোকন করেছেন।

সামাজিক বয়কট ও বন্দি জীবন: ইসলামের অগ্রযাত্রা রুখতে কুরাইশ ও বিভিন্ন গোত্র চক্রান্ত করে যার পরিণতিতে প্রিয় নবী (ﷺ) ও তাঁর সাথীদের গিরিদুর্গে ৩ বছর চরম ধৈর্যের অগ্নি পরীক্ষায় কঠিন দুর্গতির মধ্যে বন্দি জীবন কাটাতে হয়।

মাদীনায় হিজরত ও ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা: মুসলিমদের চরম দুর্দিনে এবং তাদের আশ্রয় ও সহযোগিতার পরিণাম যে ভয়াবহ হবে তা জেনে-বুঝে আসন্ন সমস্যা ও বিপদকে তুচ্ছ মনে করে ইসলামের নবীকে পেতে ব্যাকুল হয়ে উঠে ইয়াসরিববাসী (মাদীনাবাসী)। আল্লাহর হুকুমে নবী (ﷺ) রাতের আঁধারে সকল কাফিরদের চোখ ফাঁকি দিয়ে সঙ্গী আবূ বাক্র সিদ্দীক্ব (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে নিয়ে মাদীনার উদ্দেশ্যে রওনা দেন। মাদীনায় নবী (ﷺ) উপস্থিত হতেই তাঁকে মাদীনাবাসীরা উষ্ণ সংবর্ধনা দিয়ে বরণ করে নেন। এরপরে প্রিয় নবী (ﷺ) মাদীনায় প্রবেশ করে জামা'আতে সালাত আদায় করে কুবা নামক স্থানে ইসলামের প্রথম মাসজিদ স্থাপন করেন এবং সহাবী আবূ আইয়ুব আল আনসারী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর বাড়ীতে কিছুদিন অবস্থানের পরে মাসজিদে নববীর স্থানে একখণ্ড জায়গায় মাসজিদ ও বাড়ি নির্মাণ করে বসবাস করতে থাকেন। আল্লাহর ইচ্ছায় মাদীনার আনসার ও মাক্কার মুহাজিরদের মধ্যে রাসূল (ﷺ) ভ্রাতৃত্ববন্ধন ও বন্ধুত্ব স্থাপন করে দেন। মাদীনার ইয়াহূদীদের সাথে নিজধর্ম পালন, শান্তিপূর্ণ সহঅবস্থান ও বহিঃশত্রু আক্রমণে একত্রে মুকাবিলা করার চুক্তি করেন।

বিশ্বব্যাপী দা'ওয়াত ও পবিত্র জিহাদ: চলতে থাকে দেশ থেকে দেশান্তরে ইসলামের দা'ওয়াতের তৎপরতা। এতে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠে মাক্কার কাফির ও মুশরিকরা। তারা ক্রুদ্ধ ও ক্ষিপ্ত হয়ে মুনাফিক্ব ও ইয়াহূদীদের প্ররোচিত করতে থাকে। একদিন একজন নিরীহ সাধারণ মুসলিমের হত্যার প্রতিবাদে বেজে উঠে যুদ্ধের দামামা। বদ্‌র নামক স্থানে ইসলামের শ্রেষ্ঠ দুশমন আবূ জাহ্‌েল-এর নেতৃত্বে এক হাজার বিপুল অস্ত্র-সজ্জে সুসজ্জিত সৈন্যবাহিনী মুকাবিলায় প্রস্তুত নিরস্ত্র তিনশ তেরজন মুসলিমের সাথে লড়াই হয়। এ যুদ্ধে মুসলিমরা দুর্বল হয়েও

বিজয়ী হয়। আর পরবর্তীতে কাফিররা আরো শক্তি ও যুদ্ধাস্ত্র নিয়ে মুসলিমদের নির্মূল করার জন্য একের পর এক চালাতে থাকে উহুদ, মুরাইসি, খন্দক নামক যুদ্ধ। এরপর দীর্ঘদিন নিজ মাতৃভূমি মক্কা ছেড়ে আসা মুসলিমদের মন অস্থির হয়ে উঠে মাক্কার কা'বার প্রতি মহব্বত ও অনুরাগে। নিরস্ত্র মুসলিমরা হজ্জ করতে মাক্কায় রওনা হওয়ার পথে হুদায়বিয়াহ্ নামক স্থানে কাফিররা বাধা দেয়। এরপরে এ বছর ফিরে যাওয়ার শর্তে তাদের সাথে এক চুক্তি স্বাক্ষারিত হয় যা বাহ্যিক ক্ষতি ও অপমানজনক মনে হলেও অদূর ভবিষ্যতে ফলদায়ক। যা হুদায়বিয়ায় সন্ধি নামে খ্যাত। অর্থাৎ- এবার ফিরে যাবে অন্যতম এ চুক্তি শর্ত অনুযায়ী মাদীনায়, আর আগামীতে হজ্জ করতে আসবে কাফিরদের দেয়া শর্তের ভিত্তিতে।

আদর্শের শ্রেষ্ঠ মডেল সহাবায়ি কিরাম: বিশ্বনবী (ﷺ)-এর জন্য আল্লাহর সর্বশেষ পাঠানো পয়গাম (আল-কুরআন) সমগ্র দুনিয়ায় প্রচারিত হওয়া প্রয়োজন ছিল। এই বিরাট কাজের জন্য কোনো ব্যক্তি বিশেষের জীবনকালই যথেষ্ট হতে পারে না, তাই প্রিয় নবী (ﷺ) তাঁর হাতে এমন একদল সহাবা তৈরি করলেন। যারা শৌর্য-বীর্যে, আখলাক্ব-চরিত্রে, জ্ঞান-বুদ্ধিতে, ত্যাগ-তিতিক্ষাসহ সবগুণে ছিলেন গুণান্বিত। যারা তাঁর তিরোধানের পরও তাঁর মিশনকে অব্যাহত রাখবেন। পরবর্তীতে এই সহাবীগণই বিশ্বের আনাচে-কানাচে দীন প্রচার, রাষ্ট্র পরিচালনা ও নির্বিক সৈনিকের দায়িত্ব পালন করে বিশ্বের ইতিহাসে অতুলনীয় সোনালী অধ্যায় রচিত করে গেছেন। এরই ধারায় এখনো অব্যাহত রয়েছে বিশ্বব্যাপী ইসলামের অগ্রযাত্রা।

মক্কা বিজয়: ৮ম হিজরির ১০ রমাযান মাক্কার দিকে রওনা হলেন মুজাহিদদের দশ হাজার মুহাজির ও আনসারদের সমন্বয়ে সুশৃঙ্খল বাহিনী প্রিয় নবী (ﷺ)-এর সাথে। এ সংবাদ মাক্কায় ছড়িয়ে পড়লে মুশরিকদের মনে চরম ভীতি ও আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। আল্লাহর সাহায্যে বিনা বাধায় মুসলিম বাহিনী শান-শওকতের সাথে মক্কা নগরীতে বিজয়ী বেশে প্রবেশ করে। আল্লাহর নবীর নেতৃত্বে কাবা ঘর সাতবার ত্বওয়াফ করেন ও কাবার ভিতরের মূর্তি ভেঙ্গে ফেলা হয় ও দেয়ালে অঙ্কিত ছবি মুছে ফেলা হয়। এরপর নির্যাতন ও হত্যাকারী মুশরিকদের ডাকা হলে উপস্থিত মুশরিকরা মাথা নিচু হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাদেরকে দয়ার্দ্র ভাষায় ক্ষমা করে দেয়ার কথা ঘোষণা করেন। যা বিশ্বের ইতিহাসে বিরল। এর ফলশ্রুতিতে কোনো মুসলিম কাফিরকে হত্যা, প্রতিহিংসা, প্রতিশোধ না নেয়ায় কয়েকজন ব্যতীত প্রায় সকল কাফির, মুশরিকরা মুসলিম হয়ে যায়।

বিদায় ভাষণ ও ওফাত: হুনায়নের যুদ্ধ, তাবূকের যুদ্ধের পর হাজ্জ মৌসুমে নবী (ﷺ) মুসলিম জাতির উদ্দেশে বিদায় হাজ্জে মুসলিম জাতির জন্য মৌলিক দিক-নির্দেশনামূলক এক ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। এতে প্রায় ১ লক্ষ সাহাবী উপস্থিত ছিলেন। এরপর ১২ দিন অসুস্থতার পর ১১ হিজরি ১২ রবীউল আওয়াল সোমবার চাশ্তের সলাতের সময় নবী (ﷺ)-এর বয়স যখন ৬৩ বছর তখন তাঁর বন্ধু আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়ে ইহজগত ত্যাগ করেন। (ইন্না- লিল্লা-হি ওয়া ইন্না- ইলাইহি র-জি'ঊন)

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর গঠন আকৃতি: ১. আমাদের প্রিয় নবী (ﷺ) মধ্যম অবয়ব ছিলেন। ২. রং ছিল উজ্জ্বল সাদা লাল মিশ্রিত। ৩. লাবণ্যময় চেহারা ও টানা চোখ মাথা বড়, প্রশস্ত কপাল, পাতলা ও খাড়া নাক, কালো চক্ষু বর্ণ ও লম্বা পলক। ৪. চিকন ভ্রু, মুখমণ্ডল ডিম্বাকার ছিল। উচ্চ বুক, ঘন দাড়ি, ঘন মাথার কেশ, হালকা কোড়ানো মাশল বাহু মূল সুলোম্বিত হস্তদ্বয়ের ও পায়ের পাতা ছিল পুরু। ৫. মাথার চুল কখনও কান, কখনও লতি বা তার নীচ পর্যন্ত লম্বা হতো। সামনের দাঁত দুটির মাঝে কিছুটা ফাঁকা ছিল। কথা বলার সময় দাঁত থেকে আলো বিচ্ছুরিত হতো। ৬. হাড়ের জোড়াগুলো ছিল মোটা। শরীর ছিল প্রায় পশমহীন। ৭. দু'কাঁধের মধ্যভাগে কবুতরের ডিমের আকৃতির মতো উঁচু লাল মাংসপিণ্ড ছিল যা নুবুওয়্যাতের মোহর। ৮. চামড়া ছিল নরম মসৃণ ও হাতের জোড়াগুলো মজবুত। ৯. সুঠাম চেহারা ছিল সুদর্শন যা দেখে অন্তর জুড়িয়ে যেত ও মনের গভীর প্রভাব বিস্তার করত। ১০. তাঁর শরীরের ঘামবিন্দু মতির মতো ঝলঝল করত আর তা আতরের মতো খুশবু হতো। ১১. তিনি (ﷺ) মুচকি

হাসতেন, তিনি কোমল স্বভাবের সত্যভাষী ও নম্র আচরণকারী ছিলেন। **১২.** তিনি (ﷺ) অতি সাধারণ জীবনযাপন করতেন। খেজুরের ছাল ও পাতার তৈরি বিছানায় শুইতেন।

রাসূল (ﷺ)-এর কয়েকটি অলৌকিক ঘটনাঃ ১. রাসূলূল্লাহ (ﷺ) সহাবীদের নিয়ে খেতে বসলে কোনো খাদ্য পাত্রে হাত দিলে সেখানে বারাকাত নাযিল হতো। যেখানে একজনের খাদ্য অসংখ্যজনে খেতে পারত (সুবহানাল্ল-হ)। **২.** একবার মাদীনার এক ভয়ংকর আওয়াজ শুনে রাসূল (ﷺ) একাই নির্ভয়ে সে আওয়াজের কেন্দ্রস্থল খোঁজার জন্য বেরিয়ে পড়েন (আল্ল-হু আকবার)। **৩.** রাসূল (ﷺ)-কে আল্লাহ তা'আলা এক রাতে (মি'রাজে) উর্ধ্ব আকাশে নিয়ে যান এবং জান্নাত ও জাহান্নাম দেখান। আর আসমানের স্তরে বিভিন্ন নবীদের সাথে সাক্ষাৎ পান। আর এই মি'রাজেই পাঁচ ওয়াক্ত সালাত উম্মাতে মুহাম্মাদীর জন্য আল্লাহ ফার্য করে দেন। **৪.** বদ্র যুদ্ধে রাসূল (ﷺ)-কে ডানে ও বামে দুজন সাদা পোশাক পরিহিত ফেরেশ্তারা পাহারা দিয়েছেন এবং শত্রুর আক্রমনের হাত থেকে রক্ষার জন্য লড়াই করেছেন কিন্তু ঐ দুজনকে পূর্বে বা পরে কোনো দিন দেখা যায়নি (আল্ল-হু আকবার)। **৫.** রাসূল (ﷺ) যদি কারো জন্য দু'আ করতেন আল্লাহ তা'আলা সেই দু'আ কবূল করে নিতেন (সুবহা-নাল্ল-হ)। **৬.** একবার মদীনায় খাল খননকালে একটি শক্ত বড় পাথরকে কেউ ভাঙ্গতে পারছিলেন না, তাই রাসূল (ﷺ) সেই পাথররে ওপর আঘাত করলে তা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে বালুকণায় পরিণত হয়ে যায় (সুবহা-নাল্ল-হ)। **৭.** কখনো পানির সংকটে রাসূল (ﷺ) স্বল্প পানির ওযূর পাত্রে হাত ডুবালে তাঁর আঙ্গুল দিয়ে পানির ফোয়ারা বের হত (সুবহা-নাল্ল-হ)। **৮.** অসুস্থ সহাবীদের চোখে বা আঘাতের স্থানে রাসূল (ﷺ) ফুঁ বা থুথু দিলে সহাবীরা সুস্থ হয়ে যেতেন (সুবহা-নাল্ল-হ)। **৯.** একবার রাসূল (ﷺ) কাফিরদের প্রমাণ দিতে গিয়ে তাঁর হাত দ্বারা আকাশে চাঁদকে দ্বিখণ্ডিত করে দেখিয়ে দিয়েছিলেন (আল্ল-হু আকবার)। **১০.** ইসলামে প্রাথমিক যুগে গোপনে যখন দা'ওয়াত চলত তখন রাতে রাসূল (ﷺ)-এর সাহাবীদের চলার পথে লাঠিগুলো প্রদীপের মতো আলোকিত হতো আর প্রত্যেকের জন্য তাদের নিজ নিজ গন্তব্যে পৌঁছা সহজ হয়ে যেত। **১১.** রাসূল (ﷺ)-কে গাছ ও পাথর নবী হওয়ার আগে ও পরে সালাম করত। **১২.** রাসূল (ﷺ) ক্বিয়ামাতের দিন আদাম সন্তানদের সর্দার হবেন। সকলের আগেই ক্বর থেকে উঠবেন। সকলের আগেই তিনি আল্লাহর নিকট সুপারিশ করবেন। তাঁর সুপারিশই (শাফা'আতই) আল্লাহ সর্বপ্রথম কবূল করবেন। **১৩.** ক্বিয়ামাতের দিন অন্যান্য নবীদের তুলনায় রাসূল (ﷺ)-এর উম্মাতই সবচেয়ে বেশি হবে এবং রাসূল (ﷺ)-ই সর্বপ্রথম জান্নাতের দরজা খুলবেন।

ছোটদের প্রিয় নবী (ﷺ)ঃ প্রিয় নবী মুহাম্মাদ (ﷺ) শিশু-কিশোরদের অনেক ভালোবাসতেন। শিশু-কিশোরদের মাথা বুলিয়ে ও কোলে তুলে আদর করতেন। শিশু-কিশোররা তাকে সালাম দেয়ার আগে তিনি প্রথমে সালাম দিতেন। শিশু-কিশোরদের খেলাধুলায় বাধা দিতেন না। মায়ের সাথে বাচ্চারা এসে সলাতের জামা'আতে কান্নাকাটি করলে বিরক্ত না হয়ে সালাত সংক্ষিপ্ত করতেন। প্রিয় নবী (ﷺ)-এর দাদা যিনি মাক্কার কুরাইশদের সরদার অর্থাৎ- আবূ ত্বালিব-এর জন্য নির্দিষ্ট বসার স্থানে কাউকে বসতে না দিলেও বালক মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে দাদা বসতে দিতেন এবং বলতেন, তার মর্যাদা অসাধারণ। প্রিয় নবী (ﷺ) যুব বয়সে একবার চাচার সাথে সিরিয়া যাওয়ার পথে এক পর্যায়ে বুহাইরা নামক খ্রিষ্টান পাদ্রী গির্জা ছেড়ে মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর নিকট আসেন এবং বলেন, তিনি সারা দুনিয়ার জন্য রহমাত হবেন। কেননা তার আসার সময় সব গাছপালা এবং পাথর সাজদায় নত হয়েছে। আর এগুলো নবী ছাড়া অন্য কাউকে সাজদাহ্ করে না। তাদের ধর্মীয় গ্রন্থে এ সম্পর্কে তথ্য পেশ করেন যা যুবক মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর মধ্যে ছিল তাই তাকে সিরিয়ায় নিতে নিষেধ করলেন। কেননা সেখানকার ইয়াহূদীরা তাঁকে ক্ষতি করতে পারে। তাই চাচা আবূ ত্বালিব প্রিয় নবী (ﷺ)-কে সিরিয়ায় না নিয়ে মাক্কায় ফেরত পাঠান।

সূত্রঃ সিরাত ইবনু হিশাম, আর্ রহীকুল মাখতুম, মোস্তফা চরিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর বিপ্লবী জীবন, বিশ্ব নবী মুহাম্মাদ ﷺ, ইসলামী বিশ্বকোষ, সীরাতে সাইয়্যেদুল মুরসালিন।

৬৬ বর্ষ ॥ ০১-০২ সংখ্যা ❖ ০৭ অক্টোবর- ২০২৪ ঈ. ❖ ০৩ রবিউস্ সানি- ১৪৪৬ হি.

কবিতা

ছন্দ

মোল্লা মাজেদ★

ছন্দ ভরা গান কবিতায়
ঊর্মি দোলায় ছন্দ
ছন্দ দোলায় ধীর সমিরণ
টুটায় নিরানন্দ।

ওয়াহীর বানী আল কুরআনে
কি অপরূপ ছন্দ
হত ভাগায় বুঝতে না পায়
ভাগ্য তাদের মন্দ।

ছন্দ ভরা শুকনো পাতায়
সুর সেধে গায় সবুজ বন
প্রশান্তিতে যায় ভরে যায়
তৃষায় কাতর চাতক মন।

ভোর বিহানে মিনার চূড়ে
ছন্দ বিলায় শিরিন সুরে
গুঞ্জরণী ছন্দ ধরে
ভ্রমর ওড়ে শূন্যে
ছন্দে ঘোরে বিশ্ব নিখিল
জীবন ধারার জন্যে।

★ বরেণ্য কবি, রঘুনাথপুর, পাংশা, রাজবাড়ি-৭৭২০।

মাজার

শেখ শান্ত বিন আব্দুর রাজ্জাক★

মাজারে আর দরবারে ভাই
ভুলেও কভু যেও না
আল্লাহ তা'আলা ছাড়া কারো কাছে
কোনোকিছু চেও না।

মনের যত আশা তোমার
চাওয়ার আছে যত
দুঃখকষ্ট আছে যাহা
আছে মনের ক্ষত-
রবের কাছে যাঞ্চা করো
মিটবে তোমার বাসনা।

সন্তান হবে মিটবে আশা
গেলে বাবার মাজারে
ক্ষয়ক্ষতি আর হবে না তো
থাকলে তাবিজ তাগা রে-
এই বিশ্বাস থাকলে মনে
মুসলিম তুমি থাকবে না।

কোনোকিছু হারিয়ে গেলে
গণকের কাছে যাও ক্যান
গায়েব সেতো আল্লাহ জানে
কুরআন পড়ে নাও জ্ঞান-
গণক যদি বিশ্বাস করো
ঈমান তোমার রবে না।

★ বামনাছড়া, উলিপুর, কুড়িগ্রাম।

স্বাস্থ্য-সচেতনতা

বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস ২০২৪
কর্মস্থলে মানসিক স্বাস্থ্য

–মুহাম্মদ শামসুল আলম*

এ বছর বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবসের (১০ অক্টোবর ২০২৪) প্রতিপাদ্য হচ্ছে 'কর্মক্ষেত্রে মানসিক স্বাস্থ্যের অগ্রাধিকার' –এখনই সময় (It is Time to Prioritise Mental Health in The Work Place)।

পৃথিবীর জনসংখ্যার শতকরা ৬০ জন কর্মজীবী মানুষ। আবার তাদের সময়ের ৬০ শতাংশ কাটে কর্মস্থলে। কাজে নিয়োজিত থাকলে মানুষের শরীর ও মন ভালো থাকে, এটি একটি স্বিকৃত ধারণা। কিন্তু এটিও সত্য যে কর্মস্থলের পরিবেশ ও বিভিন্ন উপাদান মানুষের জন্য ক্ষতিকর কিছুরও কারণ হতে পারে। মানুষের মানসিক স্বাস্থ্য তাদের কাজকে প্রভাবিত করে, আবার কাজও তাদের মানসিক স্বাস্থ্যকে প্রভাবিত করে। আর এর ফল কর্মজীবী মানুষ, তাদের পরিবার, প্রতিষ্ঠান ও সমগ্র অর্থনীতিতে প্রতিফলিত হয়। এই সত্য বিশ্বব্যাপী পর্যবেক্ষণে দৃশ্যমান। অনিরাপদ ও অস্বাস্থ্যকর কাজের পরিবেশ মানসিক স্বাস্থ্যের অবণতি ঘটায় এবং দুর্বল মানসিক স্বাস্থ্য একজনের কর্মক্ষমতা হ্রাস করে, যদি না তাকে সহায়তা দেওয়া হয়।

সমগ্র বিশ্বে শতকরা ১৫ জন কর্মজীবী মানুষ মানসিক সমস্যায় ভুগে থাকেন। মানসিক সমস্যা ও মানসিক রোগে বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন ভাবে আক্রান্ত হয়ে থাকেন এবং তাদের অসুবিধা ও কষ্টও বিভিন্ন মাত্রার হয়ে থাকে।

যথাযথ ব্যবস্থাপনা ও সহায়তা না থাকলে কাজ করার ইচ্ছা থাকলেও মানসিক স্বাস্থ্যের ত্রুটির কারণে কর্মজীবীদের আত্মবিশ্বাস, কাজে উৎসাহ-উদ্দীপনা, কর্মক্ষমতা, উপস্থিতি ও কাজে নিয়োগ পাওয়ার যোগ্যতা হ্রাস পায়। তাঁদের যারা দেখভাল করেন ও পরিবার-পরিজনেরাও অনুরূপভাবে আক্রান্ত হয়ে থাকেন।

সরকারী প্রতিষ্ঠান, কর্মস্থলে ও জনগণের মধ্যে মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কে ভুল ধারণা বিদ্যমান, সহায়তা ব্যবস্থা অপ্রতুল ও গুরুত্বহীন। মানসিক রোগের ব্যাপারে কুসংস্কার বিদ্যমান, মানসিক রোগীকে সমাজবিচ্যুত করা হয় ও বৈষম্যমূলক আচরণের সম্মুখীন হতে হয়। ফলে মানসিক রোগে আক্রান্ত কর্মীরা তাঁদের সমস্যা প্রকাশ করতে ও সহায়তা নিতে কুণ্ঠিত হন, যাতে তাঁদের চাকুরীজীবন ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।

মানসিক রোগের কারণে কাজের সুযোগ নষ্ট হয়, ফলে ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বেকারত্ব বৃদ্ধি পায়, উৎপাদন হ্রাস পায়, দক্ষ জনশক্তি কমে যায় ও রাজস্ব আদায়ে ঘাটতি দেখা দেয়।

কাজঃ মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিকসমূহ– প্রতিটি মানুষ সে মানসিকভাবে সুস্থ অথবা অসুস্থ হোক কাজের পরিবেশ তাকে ভালো অথবা মন্দ রাখতে পারে। সুন্দর কাজের পরিবেশ তার মানসিক স্বাস্থ্যকে ভালো রাখবে। এটি কেবল উপার্জনের সাথে সম্পর্কিত নয়; বরং তার জীবনের উদ্দেশ্য ও অর্জনের সাথেও সম্পর্কিত। মানসিক সমস্যা ও রোগাক্রান্ত ব্যক্তি অনেক সময় সুন্দর পরিবেশের কারণে সুস্থ বোধ করতে পারেন। তাঁর আত্মবিশ্বাস উন্নত হতে পারে, অধিকতরভাবে সামাজিক কর্মকাণ্ডে অবদান রাখতে পারেন। নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর কাজের পরিবেশ একটি মৌলিক অধিকারই শুধু নয়; বরং এর ফলে কাজের দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায়, কর্মচারী কাজে স্থিতিশীল হয়, উদ্বেগ ও দ্বন্দ্ব সংঘাত হ্রাস পায়।

অপরদিকে বেকারত্ব, অস্থিতিশীল ও অনিরাপদ চাকরি, চাকরিজীবনে বৈষম্য, নিম্নমানের কর্মপরিবেশ একজন কর্মীকে মানসিক চাপ ও মানসিক রোগগ্রস্থ করতে পারে। গুরুতর চাকুরীগত সমস্যা মানুষকে আত্মহত্যার দিকে পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারে। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ, সামাজিক শ্রেণীভেদ ইত্যাদির ভিত্তিতে কর্মস্থলে

* *লেখক, পেশায় চিকিৎসক ও জমঈয়তের স্বাস্থ্য ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক।*

বৈষম্যও মানুষকে সমস্যায় ফেলতে পারে ও গুরুতর মানসিক সমস্যার কারণ হতে পারে। এধরনের আরো সমস্যাকে মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য 'মনোসামাজিক ঝুঁকিকর' উপাদান হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

সমসাময়িক পৃথিবীতে যে পরিবর্তনগুলো ঘটছে যেমন- কারিগরি উন্নয়ন, আবহাওয়া পরিবর্তন, বিশ্বায়ন, জনগণের বিবর্তন এগুলোও মানুষ কোথায় ও কিভাবে কাজ করবে তাতে প্রভাব রাখছে। কোভিড-১৯ মহামারী এই পরিবর্তন ত্বরান্বিত করেছে, বিশেষত দূর থেকে কাজ করা, ই-বাণিজ্য, স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি। এর প্রভাব শ্রমবাজারে পড়ছে, ফলে অর্থনীতি অস্থিতিশীল হয়ে পড়ছে এবং প্রতিষ্ঠানগুলোকে নতুনভাবে সাজাতে হচ্ছে। অনেক কর্মজীবীর জন্য এই পরিবর্তন মনোসামাজিক ঝুঁকি বাড়াচ্ছে। ফলে অনেকের উপার্জন কমছে, জনগণ কোথায়, কিভাবে কাজ করবে, তাও অনিশ্চয়তার সম্মুখীন হয়ে পড়ছে।

এ বিষয়ে সক্রিয় হওয়া প্রয়োজন: কার্যকরী নীতিমালা ও তার সঠিক বাস্তবায়ন কর্মক্ষেত্রে মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নয়নে অবদান রাখতে পারে। এর ফলে মানবাধিকার ও টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সহায়ক হবে। অপরদিকে নিষ্ক্রিয়তা সমাজের জন্য গুরুতরভাবে ক্ষতিকর। সমাজে স্বাস্থ্যসেবার ঘাটতি হতে পারে, অকালমৃত্যু, অক্ষমতা, উৎপাদনশীলতা হ্রাস ইত্যাদি দেখা দিতে পারে।

তাই দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের এ বিষয়ে যথাযথ পরিবেশ সৃষ্টি ও আর্থিক সংস্থানে উদ্যোগী হতে হবে। কুসংস্কার ও বৈষম্য দূরীকরণে তৎপর হওয়া দরকার। বিভিন্ন পক্ষের সমন্বয় ও অংশীদারত্বের ভিত্তিতে পদক্ষেপ নিতে হবে।

করণীয়: আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (ILO) সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রতিটি মানুষের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের নিশ্চয়তা ও উন্নয়ন বিধান অপরিহার্য কর্তব্য। এরমধ্যে নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশ, কর্মক্ষেত্রের সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনা, যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ ও প্রয়োজনীয় পুনর্বাসনের সুযোগ। এ বিষয়গুলো সরকার, নিয়োগদাতা ও কর্মীদের সমন্বিত উদ্যোগে সম্পন্ন করতে হবে। এ বিষয়ে নিম্নলিখিত **নীতিমালা** বিবেচনাযোগ্য:

☑ কর্মীদের শারীরিক ও মানসিক সক্ষমতার সাথে সামঞ্জস্য রেখে কাজ প্রদান করতে হবে অথবা তাদের জন্য প্রযোজ্য অন্য কাজে স্থানান্তরিত করতে হবে, বেতন ও জ্যেষ্ঠতা বজায় রেখে। ☑ সমস্যা ও রোগের ক্ষতিপূরণের চেয়ে প্রতিরোধের দিকে গুরুত্ব দিতে হবে। ☑ মনোসামাজিক ঝুঁকি নির্ধারণের ও সেইসাথে সহিংসতা, অপদস্থকরণ ও বৈষম্য নিরসনের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা থাকতে হবে। ☑ কর্মীদের মানসিক সমস্যার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় আর্থিক ও অন্যান্য সহোযোগিতার ব্যবস্থা থাকতে হবে। ☑ কর্মীবৃন্দ ও তাদের প্রতিনিধিরা যেন মনোসমাজিক সমস্যাসমূহ চিহ্নিতকরণ ও তা উপশমে ভূমিকা রাখতে পারে তা নিশ্চিত করতে হবে।

সরকারের উচিত পেশাজীবীদের মনোসামাজিক ঝুঁকিসমূহ নিরূপণের জন্য সামর্থ সৃষ্টি করা। মনোসামাজিক সমস্যা নিরসনে প্রয়োজনীয় প্রতিরোধ, তত্বাবধান ও প্রস্তাবনা নিয়ে অগ্রসর হওয়া দরকার, বিশেষত ক্ষুদ্র ও মাঝারী উদ্যোক্তাদের ক্ষেত্রে। মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য সমন্বিত ব্যবস্থাপনা দরকার।

প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা: বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কিছু **নির্দেশনা** দিয়েছে যা সার্বজনীনভাববে প্রয়োগ করা যেতে পারে–

☑ পরিকল্পিত ও লক্ষভিত্তিক কাজ যা মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্যের অবণতি রোধ করে যেমন- ➢ কাজের নমনীয় পরিবেশ, ➢ কর্মীদেরকে তাদের কাজের বিষয়ে মতামত দিতে অংশীদার করা. ➢ কাজের পরিমাণ ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া সামর্থ্য অনুসারে হওয়া এবং ➢ কাজ ও জীবনের অন্যান্য বিষয়ের সামঞ্জস্য বিধান করা।

☑ মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য মনোসামাজিক ঝুঁকি নিরূপণ, তার ব্যবস্থাপনা ও উপশমের বিষয়ে তৎপর হওয়া। যেমন- কাজের স্থানে আত্মহত্যার সামগ্রী যেমন- কীটনাশক, ঔষধ ইত্যাদি না রাখা। সেইসাথে কর্মজীবীদের চাকুরীতে সন্তুষ্টি, অনুপস্থিতি, কাজে

দক্ষতা ইত্যাদিও একটি প্রতিষ্ঠানকে তার ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে উন্নত করতে হবে। প্রতিষ্ঠানগুলোতে দক্ষ ও যথাযথ তৎপরতা কর্মক্ষেত্রে মানসিক স্বাস্থ্যকে সুরক্ষা ও সহায়তা দিতে পারে।

কর্মক্ষেত্রে যে ধরনের মানসিক সমস্যা হয়: সাধারণত কর্মক্ষেত্রে মানসিক সমস্যা যে লক্ষণ নিয়ে দেখা দেয় তা নিম্নরূপ।

➢ কর্মক্ষেত্রে দক্ষতা হ্রাস, ➢ মনোযোগ ও চিন্তার সমস্যা, ➢ ঘুম ও ক্ষুধার সমস্যা, ➢ মেজাজের সমস্যা, ➢ কাজে উৎসাহের অভাব, ➢ ভয় ও হতাশা, ➢ অতি সংবেদনশীলতা, ➢ অস্বাভাবিক আচরণ, ➢ শরীরে ব্যথা-বেদনা।

এসব লক্ষণাদির অন্তরালে যে **মানসিক রোগ বা সমস্যা** থাকতে পারে। তা নিম্নরূপ:

➢ মানসিক চাপ বা স্ট্রেস, ➢ বিষণ্নতা বা ডিপ্রেশন, ➢ উৎকণ্ঠা বা এংজাইটি, ➢ বিরূপ ব্যবহার।

এসবের জন্য করণীয়: ➢ কাজ ও জীবনের অন্যান্য অংশের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান, ➢ রিলাক্সেশন বা শিথিলায়ন অভ্যাস করা, ➢ নিজের প্রাত্যহিক জীবনের যত্ন নেওয়া, যেমন- ঘুম, পুষ্টিকর খাদ্য, নিয়মিত ব্যায়াম ইত্যাদি, ➢ অন্যদের সাথে যোগাযোগ ও সহযোগীতার আদান-প্রদান, ➢ নমনীয় হওয়া, ➢ প্রয়োজনে বসের সাথে কথা বলা, ➢ কাজে দক্ষতার দিকে মনোযোগ দেওয়া, ➢ আত্মশক্তি বৃদ্ধি করা, ➢ প্রয়োজনে কোনো মনোচিকিৎসক বা থেরাপিস্টের শরণাপন্ন হওয়া।

উপসংহার: বর্তমান পৃথিবীতে মানসিক স্বাস্থ্যের গুরুত্ব এখন বেশি দেওয়া হচ্ছে, তবে এখনও তা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। কর্মক্ষেত্রে তথা জীবনের সবক্ষেত্রে এর গুরুত্ব দেওয়া এখন সময়ের দাবি। এর ফলে আমাদের জীবন সুখ, সফলতা ও সৌন্দর্য্যে পূর্ণ হবে। মহানবী (ﷺ) বলেছেন, 'ফর্য 'ইবাদতের পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ 'ইবাদত হচ্ছে বৈধ জীবিকা অন্বেষণ করা'। সুতরাং কাজ ও তার পরিবেশ উন্নত করা অবশ্যই এই 'ইবাদতের জন্য অপরিহার্য। ☒

অহেতুক চিন্তার কারণে সালাতে...

[২৫ পৃষ্ঠার পর]

১০) সাজদার স্থানে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা এবং অন্য দিকে দৃষ্টপাত না করা।

১১) ভয়-ভীতি ও ধীর স্থিরতা সহকারে সালাত আদায় করা।

১২) শয়তানের উপস্থিতি টের পেলে শয়তান থেকে মহান আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করা তথা চুপিস্বরে "আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইত্বানির রাজীম", 'বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি' পাঠ করা ও বাম দিকে অতি হালকাভাবে তিনবার থুথু নিক্ষেপ করা। যেমন- হাদীসে বর্ণিত হয়েছে–

عن عُثْمَانَ بْن أَبِيْ الْعَاصِ ﷺ أنه أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ حَالَ بَيْنِيْ وَبَيْنَ صَلَاتِيْ وَقِرَاءَتِيْ يَلْبِسُهَا عَلَيَّ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : ذَاكَ شَيْطَانٌ يُقَالُ لَهُ خَنْزَبٌ، فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ فَتَعَوَّذْ بِاللهِ مِنْهُ وَاتْفِلْ عَلَى يَسَارِكَ ثَلَاثًا قَالَ : فَفَعَلْتُ ذٰلِكَ فَأَذْهَبَهُ اللهُ عَنِّيْ.

'উসমান ইবনুল 'আস থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল, শয়তান আমার সালাত ও কিরাআতে বিঘ্ন সৃষ্টি করে। তিনি বললেন, এটি হলো শয়তান। যার নাম খিনযাব। তুমি যদি এমনটি অনুভব কর, তবে "আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইত্বানির রাজীম" পাঠ করো এবং তোমার বাম পাশে তিনবার হালকাভাবে থুথু নিক্ষেপ করো। অতঃপর তিনি বলেন, আমি এমনটি করায় আল্লাহ তা'আলা আমার এ সমস্যা দূর করে দিয়েছেন।[৮৪]

উল্লেখ্য যে, শরীর বা কাঁধ বাম দিকে ঘুরানোর প্রয়োজন নেই। কেবল মাথাটা সামান্য বাম দিকে নিয়ে খুব হালকাভাবে থুথু ফেলার মতো করতে হবে। (এতে মুখ থেকে পানি নির্গত হবে না।) এমনটি করলে শয়তান লাঞ্ছিত অবস্থায় পলায়ন করবে –ইন্শা-আল্লাহ।

অতএব আমরা যদি আমাদের সালাতের মাধ্যমে সফলতা লাভ করতে চাই তবে অবশ্যই উল্লিখিত বিষয়গুলো স্মরণ রাখতে হবে। তবেই আমরা ইবলিসী ওয়াসওয়াসামুক্ত সালাত আদায় করতে পারবো –ইন্শা-আল্লাহ। ☒

[৮৪] *সহীহ মুসলিম- হা. ৬৮/২২০৩।*

الفتاوى و المسائل ❖ ফাতাওয়া ও মাসায়িল

জিজ্ঞাসা ও জবাব

ফাতাওয়া বোর্ড, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: আর তোমরা দ্বীনের মধ্যে নতুন সংযোজন করা হতে সাবধান থেকো। নিশ্চয়ই (দ্বীনের মধ্যে) প্রত্যেক নতুন সংযোজন বিদ্'আত, প্রত্যেকটি বিদ্'আতই ভ্রষ্টতা, আর প্রত্যেক ভ্রষ্টতার পরিণাম জাহান্নাম।

(সুনান আন্ নাসায়ী- হা. ১৫৭৮, সহীহ)

জিজ্ঞাসা (০১): ***মসজিদের একদিকে দেয়াল ঘেসে কিছু পুরাতন কবর আছে। এখন মসজিদ প্রশস্ত করার দরকার। কিভাবে করতে হবে, দয়া করে জানাবেন।***

সানাউল্লাহ
সিক্কাটুলী, ঢাকা।

জবাব: কবরস্থান পুরাতন হোক কিংবা নতুন হোক, বিনা কারণে সেখানকার কবর স্থানান্তর করা বৈধ নয়। তবে বিশেষ প্রয়োজনে যদি কবর সরানোর প্রয়োজন পড়ে এবং কবর সরানো ছাড়া আর কোনো উপায় না থাকে, তাহলে কবর অন্যত্র সরিয়ে সেখানে মানুষের প্রয়োজনে বিভিন্ন স্থাপনা নির্মাণ করা যাবে। তবে সেখানে যদি দাফন কৃত মানুষের কোনো অংশ পাওয়া যায়, তাহলে সেগুলো মুসলিমদের অন্যান্য কবরস্থানে সসম্মানে দাফন করতে হবে।

এবার আপনার প্রশ্ন প্রসঙ্গে আসি। তার আগে উল্লেখ করতে চাই যে, নবী (ﷺ) একাধিক সহীহ মারফূ' হাদীসে কবরকে বহাল তবিয়তে রেখে তার উপর মসজিদ নির্মাণ করতে কঠোর ভাষায় নিষেধ করেছেন এবং সেটাকে অভিশপ্ত ইয়াহুদ-নাসারাদের স্বভাব বলে উল্লেখ করেছেন– ***(সহীহুল বুখারী- হা. ৪৩৫)***। অতএব কবরের উপর মসজিদ নির্মিত হলে সেখানে সালাত বিশুদ্ধ হবে না।

মসজিদের এক দিকের কবরগুলো না সরিয়ে যদি অন্যদিকে মসজিদ প্রশস্ত করার সুযোগ থাকে, তাহলে সেকেই প্রশস্ত করা আবশ্যক। অন্যদিকে জায়গা খালি রেখে কবরের উপর হস্তক্ষেপ করা ঠিক হবে না। আর যদি মুসাল্লীদের প্রয়োজনে কবরের দিকেই মসজিদ সম্প্রসারণ করার প্রয়োজন পড়ে, তাহলে কবরগুলো অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে সেখানে মসজিদ নির্মাণ করা যাবে। অতএব, প্রয়োজন সাপেক্ষ মসজিদ প্রশস্ত করার জন্য কবরগুলো অন্যত্র সরানো জায়িয আছে– ***(বিস্তারিত দেখুন: ফাতাওয়া নূরুন আলাদ দারব- ফাতাওয়া নং- ১১৯)***। এখানে আরো উল্লেখ্য যে, জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বিশেষ প্রয়োজনে ও কারণে তার পিতা 'আব্দুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে দাফন করার ছয় মাস পর কবর থেকে তুলে অন্যত্র দাফন করেছেন– ***(দেখুন: সহীহুল বুখারী- হা. ১৩৫২)***। সুতরাং সহীহ মারফূ' হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত হচ্ছে যে, প্রয়োজন বশত কবর সরানো জাযিয আছে।

জিজ্ঞাসা (০২): ***বিকাশে লেনে-দেন করার হুকুম জানতে চাই।***

ইয়ামিন খান
পিরোজপুর।

জবাব: আধুনিক লেনদেনের অন্যতম একটি মাধ্যম হচ্ছে বিকাশ। এটা ব্র্যাক-এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান। উল্লেখ্য যে, ব্র্যাক ব্যাংক হচ্ছে বাংলাদেশের অন্যান্য ব্যাংক-এর মতোই একটি সুদি ব্যাংক। সুদি ব্যাংক-এর সাথে লেনদেন করা বৈধ নয়। এমনকি সুদি ব্যাংক-এর গাড়ি চালক হয়ে তাদেরকে আনা-নেওয়া করাও বৈধ নয়। এ ব্যাপারে আলেমদের ফাতাওয়া একদম পরিস্কার। তবে বিশেষ প্রয়োজনে যেহেতু সুদি ব্যাংক-এর সাথে লেনদেন করা বৈধ, অনুরূপ প্রয়োজনবশত বিকাশ ব্যবহার করলে গুনাহ হবে না। কেননা ইসলামী শরিয়তের একটি মূলনীতি হচ্ছে– الضرورة تبيح المحذورات. অর্থাৎ- "বিশেষ প্রয়োজন অবৈধ জিনিষ গ্রহণ করা বৈধ"। যেমন- জান বাঁচানোর জন্য মৃত জন্তুর গোশ্ত ভক্ষণ করা যেতে পারে। তবে বিকাশ ব্যবহার না করে যদি বিকল্প বৈধ ব্যবস্থা থাকে, তাহলে বিকাশ বাদ দিয়ে সেই বৈধ পন্থা ব্যবহার করা এবং বিকাশ ব্যবহার না করাই ভালো। মহান আল্লাহই অধিক জানেন।

জিজ্ঞাসা (০৩): ***সাপ্তাহিক আরফাত পত্রিকায় বিগত কোনো এক সংখ্যার প্রশ্নোত্তর কলামে লিখা হয়েছে যে, কাফিরদের একটি মসজিদ যেরার ছিল। অথচ আমাদের***

জানামতে মসজিদ যেরার ছিল মদীনার মুনাফিক্বদের। আর যদি কাফিরদের মসজিদ যেরার থেকেই থাকে, তাহলে সেটা কোথায় ছিল? দয়া করে জানাবেন।

আব্দুল্লাহ
যাত্রাবাড়ি, ঢাকা।

জবাব: ভাই আপনি সম্ভবত ভুল বুঝেছেন অথবা জবাবটিতে ভুলক্রমে মুনাফিক্বদের স্থলে কাফিরদের লিখা হয়ে গেছে। কারণ, মসজিদ যিরার মুনাফিক্বদেরই ছিল। নবী (ﷺ) যখন তাবুক যুদ্ধে গেলেন, তখন বিভিন্ন অযুহাত দেখিয়ে মুনাফিক্বরা পিছনে থেকে গেলো। আর তারা তাবুক যুদ্ধে বের হওয়ার আগে রাসূল (ﷺ)-এর কাছে এসে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা দুর্বল ও বৃদ্ধ লোকদের জন্য আমাদের এলাকায় একটি মসজিদ নির্মাণ করেছি। আপনি যদি আমাদের এখানে এসে মসজিদটিতে সালাত আদায় করতেন, তাহলে এটা অনুমোদন পেয়ে যেতো। তিনি তাদের কথা শুনে বললেন, তোমরা এখন যাও। আমি এখন তাবুক যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে ব্যস্ত আছি। যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে তোমাদের ওখানে যাবো। আসলে প্রকাশ্যে এটা ছিল মসজিদ; কিন্তু তাদের গোপন উদ্দেশ্য ছিল এখানে বসে তারা গোপনে ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে শলা-পরামর্শ করা। আর রাসূল (ﷺ)-কে সেখানে ডেকে নিয়ে তারা তাঁকে হত্যা করারও গোপন ষড়যন্ত্র এঁটেছিল। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা ওয়াহীর মাধ্যমে তাদের মসজিদের আসল অবস্থা তাঁর নবীকে জানিয়ে দিলেন। তাই তিনি লোক পাঠিয়ে মুনাফিক্বদের মসজিদটি আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে ছাই করে ফেললেন। এটাই হচ্ছে মসজিদ যিরার ইতিহাস। এটা ছিল মদীনার একপ্রান্তে, যা নির্মাণ করেছিল মুনাফিক্বরা। ইসলামের ইতিহাসে কাফিরদের কোনো মসজিদ যিরার ছিল না।

জিজ্ঞাসা (০৪): বউয়ের সাথে ঝগড়ার এক পর্যায়ে হালকা রাগান্বিত হয়ে তালাকের ভয়াবহতা না জেনে ও বুঝে বউকে ১, ২, ৩ তালাক, এভাবে বলে ফেলি। এমতাবস্থায় আমাদের তালাক কি পরিপূর্ণ হয়েছে? আমাদের এক সাথে থাকা কী এখন উচিত কি-না?

শিমুল হোসেন
খুলনা।

জবাব: কেউ তার স্ত্রীকে এক সাথে তিন তালাক দিলে এক তালাক হবে। সেই হিসেবে সে ইচ্ছা করলে ইদ্দতের ভিতরে তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে এনে ঘর-সংসার করতে পারবে। ইসলামী শরিয়তে তাদের স্বামী-স্ত্রী হিসেবে ঘর-সংসার করতে কোনো বাধা নেই। নতুনভাবে বিবাহ পড়াতে হবে না কিংবা হিল্লাহ দেয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। এর দলিল হচ্ছে–

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ (ﷺ)، وَأَبِيْ بَكْرٍ، وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ، طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً.

"ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূল (ﷺ)-এর যুগ, আবূ বক্র (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র পুরো খিলাফতকালে এবং 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র খিলাফতকালের প্রথম দুই বছর এক বৈঠকে একসঙ্গে প্রদত্ত তিন তালাক এক তালাক হিসেবে গণ্য হতো। ***(সহীহ মুসলিম- হা. ১৪৭২)***

জিজ্ঞাসা (০৫): আমার পিতা মারা গেছেন। আমার প্রশ্ন হলো– মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে ইফতার খাওয়ানো যাবে কি?

নূর হোসেন
আগামাসি লেন, ঢাকা।

জবাব: আপনি আপনার পিতার পক্ষ থেকে ইফতার খাওয়াতে চাইলে খাওয়াতে পারবেন। এটা জায়িয আছে। মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে সাদাক্বাহ্ করার ব্যাপারে সমস্ত আলেম একবাক্যে মত দিয়েছেন। তাই কেউ চাইলে, মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে লোকদের ইফতার করাতে পারেন। এটা সাদাক্বাহ্ হিসেবে গণ্য হবে। এক হাদীসে আছে, কেউ যদি সাদাক্বার উদ্দেশ্যে মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে ইফতার খাওয়াতে চাইলে খাওয়াতে পারবে। এটির জন্য রাসূল (ﷺ) অনুমতি দিয়েছেন। তাই আপনিও আপনার পিতার জন্য খাওয়াতে পারবেন।

জিজ্ঞাসা (০৬): আমাদের হোস্টেলে দেশের নতুন বিজয় উপলক্ষে এবং যারা মারা গেছে তাদের স্মরণে নফল রোযা রাখতে চাচ্ছে সবাই। সবাই বলতে সিনিয়ররা জানিয়েছে, এখন এরকম আনুষ্ঠানিকভাবে নফল রোযা রাখা আদৌ শরিয়াহসম্মত কি-না? এই রোযার জন্য ডাইনিং এ বড় করে সেহেরির আয়োজন করা হচ্ছে, একই সাথে ইফতারের আয়োজন করা হবে। বিস্তারিত জানালে উপকৃত হবো।

শিহাব উদ্দিন
ধানীখোলা, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ।

জবাব: তিনি মৃত ব্যক্তিদের পক্ষ থেকে রোযা রাখা যাবে না এবং তার পক্ষ থেকে কুরআন তিলাওয়াত কিংবা

সালাত আদায়ও করা যাবে না। যতদূর আমরা জানি, মৃত ব্যক্তির উপর যদি মানতের রোযা থাকে, তাহলে তার পক্ষ থেকে সেটা তার ওয়ারিশগণ পালন করতে পারে। হবে নবী (ﷺ) বলেছেন:

«مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ».

"যে ব্যক্তি মারা যায় এবং তার উপর রোযা রাখা আবশ্যক থাকে; তার আত্মীয়গণ তার পক্ষ থেকে রোযা আদায় করবে"– *(সহীহুল বুখারী- হা. ১৯৫২)*। এখানে যেই সিয়ামের কথা বলা হয়েছে, আলেমদের মতে তা দ্বারা মানতের সিয়াম উদ্দেশ্য। তাই তার পক্ষ থেকে নফল সিয়াম রাখা, সালাত আদায় করা বা তার পক্ষ থেকে কুরআন পাঠ করা জায়িয নয়; বরং তার পক্ষ থেকে দান করা, তার জন্য দু'আ করা, তার পক্ষ থেকে হজ্জ করা বা 'উমরাহ্ করা জায়িয। অনুরূপ তার ঋণ পরিশোধ পরিশোধ করাও আবশ্যক।

জিজ্ঞাসা (০৭): ***মহান আল্লাহর কাছে হাজার শুকরিয়া গত ২৩/০৭/২০২৪ তারিখে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাকে একজন পুত্র সন্তান দান করেছে। গত ২৯/০৭/২০২৪ তারিখে 'আক্বিক্বাহ্ করেছি, নাম রেখেছি 'আব্দুল্লাহ বিন শাহিন। আজকে আমার বাবুর বয়স ৪২ দিন, জন্ম সনদ করবো, আমার বাবার ইচ্ছে তার নাম রাখবে 'আব্দুল্লাহ "সাজিদ" বিন শাহিন। এখন ৪২ দিন বয়সে জন্ম সনদে কি নতুন করে "সাজিদ" নামটা অন্তর্ভুক্ত করা যাবে?***

মোহাম্মদ শাহিন

বাংলাদেশ নৌবাহিনী ইউনিট, পাগলা বাজার, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ।

জবাব: জ্বী ভাই, দু'আ করি, আল্লাহ তা'আলা আপনার সন্তানকে সৎসন্তানে পরিণত করুন এবং তার পিতা-মাতার চক্ষু শীতল করুন –আমীন। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে– আপনার সন্তানের নামের সাথে "সাজিদ" শব্দটি যোগ করা যেতে পারে। তবে যোগ না করাই উত্তম। কেননা 'আব্দুল্লাহ নাম খুবই সুন্দর এবং এটা মহান আল্লাহর কাছে সবচেয়ে সুন্দর নাম। আর যদি আপনি জন্মসনদে "সাজিদ" কথাটি যোগ করতে চান, তাতেও কোনো অসুবিধা নেই। তবে এর জন্য নতুন করে 'আক্বীক্বাহ্ দিতে হবে না। প্রথম 'আক্বীক্বাই যথেষ্ট হবে।

জিজ্ঞাসা (০৮): ***আল্লাহ তা'আলা বলেন, "যখন তাদের মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসবে তারা এটাকে এক মুহূর্তও আগ-পিছু করতে পারবে না"– (সূরা আল আ'রাফ: ৩৪)। অর্থাৎ- আল্লাহ তা'আলা মৃত্যুর সময় নির্ধারণ করেছেন। স্বাধীনতার সময় বাংলাদেশের শিশু মৃত্যুর হার ছিল প্রতি হাজারে ১৪১ জন, এখন তা দাঁড়িয়েছে প্রতি হাজারে ২১ জন। অর্থাৎ- শিশু মৃত্যুর হার কমেছে ৮৫ শতাংশ, এমনকি মাতৃ মৃত্যুর হারও কমেছে। মানুষের প্রযুক্তির ও চিকিৎসা শাস্ত্রের উন্নতির কারণে এটি সম্ভব হয়েছে। এখন ইসলাম অনুযায়ী আমি কি এই কথাটি বলতে পারব যে, শুধুমাত্র প্রযুক্তি ও চিকিৎসা শাস্ত্রেই উন্নতির কারণেই শিশু ও মাতৃ মৃত্যুর হার কমানো সম্ভব হয়েছে?***

সাহাদ রহমান

ফরিদপুর।

জবাব: শুধুমাত্র প্রযুক্তি ও চিকিৎসা শাস্ত্রেই উন্নতির কারণেই শিশু ও মাতৃ মৃত্যুর হার কমানো সম্ভব হয়েছে, এই কথা কুফ্রী। কারণ, এর দ্বারা বুঝা যায় যে, জন্ম-মৃত্যু উভয়টাই মানুষের হাতে। কোনো মুসলিম এ রকম কথা বলতে পারে না। জন্ম-মৃত্য মহান আল্লাহর হাতেই। তিনি যাকে ইচ্ছা সৃষ্টি করেন, যাকে ইচ্ছা জীবিত রাখেন এবং যাকে ইচ্ছা মৃত্যু দান করেন। এটা একটা সুসাব্যস্ত 'আক্বীদাহ্-বিশ্বাস। সুতরাং তথা কথিত শিক্ষাবিদ ও চিকিৎসাবিদ ও প্রযুক্তিবিদদের কথায় কর্ণপাত করা যাবে না।

জিজ্ঞাসা (০৯): ***আমাদের কেন আহলে হাদীস হিসেবে পরিচয় দিতে হবে; আমি মুসলিম, এটাই আমার পরিচয়ের জন্য যথেষ্ট নয়? তাছাড়া আহলে হাদীস পরিচয় দেওয়ার যৌক্তিকতাই বা কী? আশাকরি সংশয় দূর করবেন।***

ফাইযুর রহমান

ফরিদপুর।

জবাব: আহলে হাদীস পরিচয় গ্রহণ করার বিষয়ে বিজ্ঞ আলেমদের মত–

একজন নতুন মুসলিম সালেহ আল মুনাজ্জিদের কাছে প্রশ্ন করেন যে, আমি ভারতে বসবাস করি। ২০০৮ সালে ইসলামে প্রবেশ করেছি। এর আগে আমি খ্রিষ্টান ছিলাম। আমি যেই মসজিদে নামায পড়ি, সেটিকে আহলে হাদীস মসজিদ বলা হয়। আমি যেখানে থাকি, সেখানকার লোকেরা মুসলিম পরিচয়ের চেয়ে আহলে হাদীস পরিচয়টি বড় করে প্রকাশ করে। অথচ তারা মুসলমান। এখন দয়া করে আমাকে বলুন: আমি কি মুসলিম হিসাবে নিজের পরিচয় দিব? না আহলে হাদীস পরিচয় দিব? উত্তরে তিনি বলেছেন, মুসলিমদের যে সমস্ত নাম সহীহ 'আক্বীদাহ্ পোষণ এবং কুরআন ও

সুন্নাহর অনুসরণের প্রমাণ বহণ করে এবং বিদআতীদের থেকে নিজেকে পার্থক্য করার জন্য সে সমস্ত নাম ব্যবহার করাতে কোনো অসুবিধা নেই। তবে কোনো সন্দেহ নেই যে, মুসলিম নামটি অত্যাধিক মর্যাদাবান ও বিরাট একটি নাম। কিন্তু আফসোসের বিষয় হচ্ছে– মুসলমানেরা বিভিন্ন দল-উপদলে বিভক্ত। কেউ সুফী, কেউ যুক্তিবাদী, কেউ শিয়া, কেউ সুফীবাদী কেউ মুতাজেলা, কেউ নকশবন্দী, মুজাদ্দেদী এবং কেউ চিশতী। এমনি আরও অসংখ্য ফির্কা। শুধু তাই নয়, কোনো কোনো ফির্কার অবস্থা এমন যে, তারা নিজেদেরকে মুসলিম মনে করলেও তারা ইসলামের সম্পূর্ণ বাইরে। যেমন- বাহাইয়া ও ব্রেলবী ফির্কা। কেউ যদি বলে আমি আহলে হাদীস, তাহলে এর অর্থ হচ্ছে– সে নিজেকে এ সমস্ত বাতিল ফির্কা থেকে আলাদা করে নিলো এবং ঘোষণা করল যে, সে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অন্তর্ভুক্ত।

শাইখুল ইসলাম আল্লামা ইবনু তাইমিয়্যাহ্ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন: যে ব্যক্তি সালাফী মাজহাব প্রকাশ করে এবং সালাফী পরিচয়ে নিজেকে পেশ করে, তাতেও কোনো দোষ নেই; বরং এই নামটি সকল মুসলিমের গ্রহণ করে নেওয়া উচিত। কেননা সালাফদের মাজহাবে হক্ব ছাড়া অন্য কিছু নেই। কোনো সালাফী যদি প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে হক্ব পথে চলে এবং সত্যকে গ্রহণ করে, সে ঐ মু'মিনের মতোই, যে প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে এবং সকল অবস্থায় হক্বের অনুসরণ করে। কিন্তু যদি প্রকাশ্যে সালাফিয়াতের দাবি করে, কিন্তু অন্তরে সালাফী 'আক্বীদাহ্ পোষণ করেনা এবং হক্ব অনুযায়ী 'আমল করে না, সে মুনাফিক্ব। তার বাহ্যিক পরিচয় গ্রহণ করা হবে এবং অন্তরের বিষয়টি মহান আল্লাহর নিকট সোপর্দ করা হবে। আমাদেরকে মানুষের অন্তর ছিদ্র করে এবং পেট চিরে দেখার আদেশ করা হয়নি। ***(দেখুন: মাজমুআয়ে ফাতাওয়া- ১/১৪৯)***

মান্যবর শাইখ ড. সালেহ ফাওযান বলেন: সত্যিকার অর্থেই যে মুসলিম সহীহ 'আক্বীদার অনুসরণ করে, তার জন্য সালাফী পরিচয় গ্রহণ করাতে কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু কেউ যদি শুধু মুখে মুখে সালাফীয়াতের দাবি করে, তাহলে সে সালাফী মানহাজের বাইরে বলে তার জন্য এই নাম ধারণ করা জায়িয নেই।

এখানে স্মরণ রাখা দরকার যে, আহলে হাদীস অর্থ এই নয় যে, তারা কুরআনের অনুসরণ করে না। সম্ভবতঃ এখান থেকেই অনেকে আহলে হাদীস নামটি গ্রহণ করতে আপত্তি করে থাকেন; বরং আহলে হাদীসগণ কুরআন ও হাদীসের উপর 'আমল করেন এবং রাসূল (ﷺ)-এর হিদায়াত ও জীবনীকে অনুসরণ করেন। সেই সঙ্গে তারা রাসূল (ﷺ)-এর পবিত্র সাহাবীদেরকেও উত্তমভাবে অনুসরণ করেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَالسَّابِقُوْنَ الْأَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِيْ تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا أَبَدًا ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ﴾

"আর যারা সর্বপ্রথম হিজরতকারী ও আনসারদের মাঝে অগ্রগামী এবং যারা উত্তমভাবে তাদের অনুসরণ করেছে, আল্লাহ সে সমস্ত লোকদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে। আর তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন এমন জান্নাত, যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত রয়েছে নদীসমূহ। সেখানে তারা থাকবে চিরকাল। এটাই হলো মহান কৃতকার্যতা।" ***(সূরা আত্ তাওবাহ্: ১০০)***

হে ভাই! ইসলাম গ্রহণ করার সাথে সাথে আল্লাহ তা'আলা তোমাকে আরেকটি অতিরিক্ত নিয়ামত দান করেছেন। আর সেটি হচ্ছে তুমি আহলে হাদীস তথা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের লোকদের সাথে থাকতে ও তাদের সাথে বসবাস করতে পারছো। সুতরাং তাদের সংস্পর্শে থাকার চেষ্টা করো, তাদের অনুসরণ করো এবং তারা যে পথে চলে সে পথেই চলো।

জিজ্ঞাসা (১০): দুই নামায একত্র করে আদায় করার হুকুম ও নিয়ম জানতে চাই। দয়া করে জানাবেন।

মো. শরিফ
রাজশাহী।

জবাব: মুসাফিরের জন্য এবং বৃষ্টি, ঠাণ্ডা বাতাস, অসুস্থতা এবং গ্রহণযোগ্য অন্যান্য কারণে দুই সালাত এক সাথে একত্রিত করে আদায় করা বৈধ। তবে সফর অবস্থায় যোহর ও 'আসর একত্র করে এবং মাগরিব ও 'ইশা একত্রে আদায় করাও সুন্নাত। তবে রাস্তায় চলা অবস্থায় এমন করা সুন্নাত। কিন্তু গন্তব্য স্থলে পৌঁছে গেলে দুই নামায একত্র করা বৈধ নয়। ইবনু 'আব্বাস

(রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত আছে, নবী (ﷺ) সফর অবস্থায়, যোহর-'আসর এবং মাগরিব-'ইশা একত্রে পড়তেন। *(সহীহুল বুখারী- অধ্যায়: ক্বসর নামায, হা. ১১০৭)*

গন্তব্যস্থলে পৌঁছে যদি যোহর-'আসর একত্রে এবং মাগরিব-'ইশা একত্রে পড়ে তাও জায়িয আছে। বিশেষ করে যখন এ রকম করার প্রয়োজন দেখা দেয়। যেমন- কোনো কাজে ব্যস্ত থাকা অথবা অতিরিক্ত বিশ্রাম গ্রহণ করার প্রয়োজন ইত্যাদি। বর্ণিত আছে– নবী (ﷺ) মক্কার আবতাহ নামক স্থানে অবস্থানকালে তাঁবু থেকে দুপুর বেলা বের হলেন। অতঃপর ওযূ করে যোহর ও 'আসরের নামায ক্বসর করে একসাথে আদায় করলেন। *(সহীহুল বুখারী- অধ্যায়: ওযূ, হা. ১৮৭; সহীহ মুসলিম)*

সহীহ মুসলিমে সা'ঈদ ইবনু যুবাইর ইবনে 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেন যে, নবী (ﷺ) তাবূক যুদ্ধে যোহর-'আসর এবং মাগরিব-'ইশা একত্রে আদায় করেছেন। সা'ঈদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন: আমি ইবনু 'আব্বাসকে জিজ্ঞাসা করলাম: কেন তিনি এমন করেছেন? উত্তরে তিনি বললেন, উম্মতের উপর যাতে কঠিন না হয়, এ জন্য তিনি এরকম করেছেন। সহীহ মুসলিমে মু'আয ইবনু জাবাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতেও এমন বর্ণনা রয়েছে।

জিজ্ঞাসা (১১): *ছোট বাচ্চা ঘুমানোর পর আমি সালাত আদায় করি। অনেক সময় দেখা যায় সালাত শেষ করার আগেই ঘুম থেকে জেগে কান্না করতে থাকে। বাচ্চা ঘুম থেকে উঠে যাবে এই আশংকায় আমি যদি যোহরের ফরয সালাত আগে আদায় করি এবং বাচ্চা ঘুম থেকে না উঠলে সুন্নাতগুলো সব একসাথে আদায় করি তাহলে কি হবে? এভাবে প্রতিদিন আগে ফরয তারপর ৪ রাকআত সুন্নত একসাতে আদায় করা যাবে কি না জানাবেন।*

ইশরাত আক্তার
সপুরা, রাজশাহী।

জবাব: জ্বী মুহতারমা, আল্লাহ তা'আলা সালাতের প্রতি আপনার আগ্রহ ও ভালোবাসা আরো বাড়িয়ে দিন। আপনার এরূপ করাটা বৈধ, এতে কোনো অসুবিধা নেই। তবে যদি কাউকে সন্তানের দেখা-শুনার জন্য নিযুক্ত করে সালাতে দাঁড়ানোর সুযোগ থাকে, তাহলে যোহরের আগের সুন্নাতগুলো আগেই আদায় করা উত্তম। আর যদি তা সম্ভব না হয়, আপনি যে পদ্ধতি সালাত আদায় করছেন এবং সন্তানের প্রতিও খেয়াল রাখছেন, তাতে কোনো অসুবিধা নেই বলেই মনে করি।

জিজ্ঞাসা (১২): *তিলাওয়াত সিজদার সঠিক নিয়ম জানাবেন দয়া করে। সিজদা কি দু'টি দেওয়া লাগে না-কি একটি দেওয়া লাগে?*

সাইরুল সেলিম
মৌলভিবাজার, ঢাকা।

জবাব: তিলাওয়াতের সাজদাহ্ হলো একটি একক সাজদাহ। একজন মুসাল্লী যখন সাজদার একটি আয়াত পড়ে তখন সে সাজদাহ্ করবে। মুসলিম ফিকাহবিদগণ এ বিষয়ে একমত। *(দেখুন: আল মাউসূআ আলফিকহীয়াহ- ২৪/২২১)*

জিজ্ঞাসা (১৩): *ছোট থেকেই আমার হায়িয অনিয়মিত। কিন্তু গত মাসে ৩০ বা ৩৫ দিন পর কোনো হায়িযের কোনো লক্ষণ ছাড়াই হঠাৎ যোহরের ওয়াক্তে সাদা স্রাব লাল আকার ধারণ করে এবং সেদিন পুরা দিন সাদা স্রাব লাল থাকে ২য় দিনে মাগরিবের পর বা মাগরিবের আগে স্রাব পুনরায় সাদা হয়ে যায় আমি তবুও অপেক্ষা করি হায়িয ভেবে এবং যে প্যাডটি ইউজ করি তাতে কোনো রকম রক্তের চিহ্ন দেখা যায়নি। ৩য় দিনে যোহর থেকে আমি নামায আদায় শুরু করি। এখন এটা কি হায়িযের অন্তর্ভুক্ত হবে? না-কি আমি গত মাসের ঐ ওয়াক্তের সালাত কাজা আদায় করবো?*

সানজিদা আক্তার
বিক্রমপুর, ঢাকা।

জবাব: বিশুদ্ধ মতে হায়িযের সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ সময়সীমা কত দিন তা নির্দিষ্ট নেই। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن﴾

"আর তারা তোমাকে হায়িয সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বলো, এটি একটি অরুচিকর অবস্থা। কাজেই তোমরা হায়িয অবস্থায় স্ত্রী মিলন থেকে বিরত থাকো। তখন পর্যন্ত তাদের সাথে সহবাসে লিপ্ত হবে না; যতক্ষণ না তারা পবিত্র হয়"– *(সূরা আল বাক্বারাহ: ২২২)*। আল্লাহ তা'আলা এখানে স্ত্রী সহবাস নিষিদ্ধ থাকার দিনসংখ্যা নির্দিষ্ট করেননি; বরং অপবিত্রতা থেকে পবিত্র হওয়া পর্যন্ত সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে।

এটি প্রমাণ করে যে ঋতুবতী হওয়াই সহবাস নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ। যখনই ঋতু পাওয়া যাবে, তখনই সহবাস নিষিদ্ধ হবে এবং যখন তা পাওয়া যাবে না তখন সহবাস নিষিদ্ধ হবে না।

তাছাড়া নির্দিষ্ট দিন সংখ্যা বেঁধে দেয়ার কোনো দলিলও নেই। দিন সংখ্যা নির্ধারিত থাকলে তা বর্ণনা করে দেয়ার দরকার ছিল। সুতরাং কত বছর বয়স পর্যন্ত মহিলার হায়িয হয় অথবা প্রতি মাসে হায়িয শুরু হওয়ার পর কতদিন থাকে তা যদি শরিয়ত দ্বারা সাব্যস্ত হতো, তাহলে অবশ্যই তা মহান আল্লাহর কিতাব ও রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সুন্নাতে বর্ণিত হতো।

এর উপর ভিত্তি করে বলতে হয় যে, মহিলাদের নিকট মাসিকের রক্ত হিসেবে পরিচিত রক্ত যখনই কোনো মহিলা নিজের জরায়ু থেকে প্রবাহিত হতে দেখবে, তখনই একে মাসিকের রক্ত হিসেব গণ্য করবে। এর জন্য নির্দিষ্ট কোনো দিন সংখ্যা নির্ধারণ করবে না। কিন্তু কোনো মহিলার রক্তস্রাব যদি চলতেই থাকে; কখনো বন্ধ না হয়, অথবা সামান্য সময়ের জন্য, যেমন- মাসে একদিন বা দু'দিন বন্ধ থেকে আবার চালু হয়, তাহলে তা ইস্তেহাযার রক্ত বলে গণ্য হবে।

জিজ্ঞাসা (১৪): ঔষধ সেবন করে কোনো মহিলা যদি নিজে নিজেই হায়িযের রক্ত বের করে এবং সে যদি নামায না পড়ে থাকে, তাহলে নামাযগুলো কাযা করবে কি-না?

রিমি হোসেন
জুরাইন, ঢাকা।

জবাব: নিজের ইচ্ছায় কোনো মহিলা হায়িযের রক্ত বের করলে এবং নামায পরিত্যাগ করে থাকলে উক্ত নামাযের কাযা আদায় করতে হবে না। কেননা যখনই হায়িযের রক্ত দেখা যাবে, তখনই তার হুকুম প্রযোজ্য হবে। অনুরূপ কোনো মহিলা যদি ঋতুস্রাব বন্ধ করার জন্য ঔষুধ গ্রহণ করে এবং তার ফলে ঋতুস্রাব না আসে, তাহলে নামায ও সিয়াম যথাসময় আদায় করবে এবং সিয়ামের কাযা করবে না। কেননা সে তো ঋতুবতী নয়। অতএব যে হুকুমকে কারণের সাথে যুক্ত করা হয়েছে, তা পাওয়া গেলেই হুকুম প্রযোজ্য হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى﴾

"আর তারা তোমার কাছে জিজ্ঞাসা করে হায়িয সম্পর্কে। বলো, সেটি একটি অশুচিকর ও অপরিচ্ছন্ন অবস্থা"– ***(সূরা আল বাক্বারাহ: ২২২)***। অতএব যখনই এই অপবিত্রতা পাওয়া যাবে, তার হুকুমও পাওয়া যাবে। যখন অপবিত্রতা থাকবে না, তখন কোনো হুকুমও থাকবে না।

জিজ্ঞাসা (১৫): কোনো মহিলা যখন তার থেকে প্রবাহিত রক্তের মধ্যে পার্থক্য করতে না পারবে যে, এটি কি হায়িযের রক্ত না কি ইস্তেহাযার রক্ত না-কি অন্য কিছুর, তখন সে কী করবে?

সুমাইয়া আক্তার
যশোর।

জবাব: মহিলাদের জরায়ু থেকে নির্গত রক্তের ব্যাপারে মূলনীতি হলো, তা হায়িযেরই রক্ত। কিন্তু যখন প্রমাণিত হবে যে, তা ইস্তেহাযার রক্ত তখন ইস্তেহাযা হিসেবে গণ্য হবে। সুতরাং নির্গত রক্তকে হায়িযের রক্ত হিসেবেই গণ্য করবে। যতক্ষণ না তা ইস্তেহাযা বা অন্য কিছুর রক্ত হিসেবে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়।

জিজ্ঞাসা (১৬): কোনো মহিলার ঋতুর নির্দিষ্ট দিন ছিল ছয় দিন। অতঃপর এই দিনের পরিমাণ বৃদ্ধি হয়েছে। সে এখন কি করবে?

আফরোজা আক্তার
ময়মনসিংহ।

জবাব: কোনো মহিলার হায়িযের সাধারণ সময়সীমা যদি ছয়দিন থাকে, কিন্তু তা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে যদি নয়দিন, দশদিন বা এগারো দিন হয়ে যায়, তাহলে তা ঋতু হিসেবে গণ্য করে পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত নামায-রোযা থেকে বিরত থাকবে। কেননা নবী (ﷺ) ঋতুর জন্য নির্দিষ্ট সময়সীমা নির্ধারণ করেননি। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى﴾

"আর তারা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে হায়িয সম্পর্কে। বলো, এটা অশুচিকর ও অপরিচ্ছন্ন অবস্থা।" ***(সূরা আল বাক্বারাহ: ২২২)***

অতএব যতক্ষণ পর্যন্ত এই রক্তস্রাব বিদ্যমান থাকবে, মহিলাও নিজ অবস্থায় থেকে যাবে। পবিত্র হওয়ার পর গোসল করে সালাত-সিয়াম আদায় করবে। পরের মাসে যদি তার হায়িযের দিন পূর্বের সাধারণ সময়সীমার চেয়ে কম হয়ে যায়, তাহলে তা বন্ধ হলেই গোসল করে পবিত্র হয়ে যাবে। যদিও পূর্বের সাধারণ সময়সীমার সমান না হয়।

মোটকথা মহিলা যতদিন ঋতুবতী থাকবে ততোদিন সে সালাত-সিয়াম থেকে বিরত থাকবে। চাই ঋতুর দিন পূর্ববর্তী মাসের সমান হোক বা কম হোক বা বেশি হোক। পবিত্র হলেই গোসল করবে এবং নামায পড়বে।

জিজ্ঞাসা (১৭): ***ফজরের ২ রাকআত সুন্নত সালাতে সূরা আল কাফিরূন এবং সূরা আল ইখলা-স পড়া সুন্নাত। আমি শুনেছি মাগরিবের ২ রাকআত সুন্নত সালাতেও না-কি সূরা আল কাফিরূন এবং সূরা আল ইখলা-স পড়া সুন্নাত। এখন ফজরেরটা আমি নিশ্চিত কিন্তু মাগরিবের নামাযেরটা নিশ্চিত নই। এই ব্যাপারে জানতে চাই।***

শাহাদাত হোসেন
যশোর।

জবাব: হ্যাঁ, ফজরের সুন্নাতে এবং মাগরিবের সুন্নাতে সূরা আল কাফিরূন এবং সূরা আল ইখলা-স পাঠ করা মুস্তাহাব এবং এটি নবী (ﷺ)-এর সহীহ সুন্নাতে প্রমাণিত। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) ফজরের দুই রাকআতের প্রথম রাকআতে সূরা আল কাফিরূন এবং দ্বিতীয় রাকআতে সূরা আল ইখলা-স পাঠ করতেন। ***(সহীহ মুসলিম- হা. ৭৩৬)***

জিজ্ঞাসা (১৮): ***কেউই যদি তার সুবিধা অনুযায়ী কখনো শাফে'য়ী মাযহাব আবার কখনো হানাফী মাযহাবের ওয়াক্ত অনুসারে নামায পড়ে। যেমন- শীতকালে সে 'আসরের নামায পড়ে তারপর দুপুরে ঘুমায় কিন্তু গরমে দুপুরে ঘুমিয়ে তারপর 'আসর পড়ে। এভাবে একেক সময় একেক মাযহাব মেনে চলা কি যাবে?***

শাওন আহমেদ
কাহেল্টুলী, ঢাকা।

জবাব: ভাই, এ রকম তামাশা করা ঠিক নয়। আমাদেরকে সমস্ত বিষয়ে সালাফদের বুঝ অনুযায়ী কুরআন-সুন্নাহ ফলো করা আবশ্যক। নিজের খেয়াল-খুশি মতো কখনো এই মাযহাব আবার কখনো ঐ মাযহাব মেনে চলা বৈধ নয়। শীতকালে এক মাযহাব এবং গরমের সময় অন্য মাযহাব মেনে চলা ঠিক নয়।

জিজ্ঞাসা (১৯): ***চল্লিশ দিন অতিবাহিত হওয়ার পরও যদি সন্তান প্রসবকারী মহিলার রক্ত প্রবাহিত হতে থাকে, তাহলে তারা কি নামায পড়বে ও রোযা রাখবে?***

আফসানা আক্তার
আজিমপুর, ঢাকা।

জবাব: কোনো পরিবর্তন ছাড়াই যদি নেফাসওয়ালা মহিলার রক্তস্রাব চল্লিশ দিন অতিবাহিত হওয়ার পরও চলতে থাকলে দেখতে হবে চল্লিশ বেশি সময়ের প্রবাহিত রক্ত তার পূর্বেকার মাসিকের স্বাভাবিক রক্ত কি-না। চলিশ দিনের বেশি সময়ের রক্ত যদি তার পূর্বেকার হায়িযের সাধারণ অভ্যাসের সাথে মিলে যায়, তাহলে তা হায়িয হিসেবে গণ্য করবে। কিন্তু পূর্ববর্তী ঋতুস্রাবের স্বাভাবিক সময়ের হায়িযের অনুরূপ না হলে সে সম্পর্কে আলেমদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

একদল আলেম বলেন, চল্লিশ দিন পূর্ণ হলেই গোসল করে পবিত্রতা হাসিল করবে এবং সালাত-সিয়াম আদায় করবে। এ অবস্থায় তাকে মুস্তাহাযা বা অসুস্থ হিসেব গণ্য করা হবে।

আরেকদল আলেম বলেন, সে ষাটদিন অপেক্ষা করবে। কেননা এমন মহিলাও রয়েছে, যার ষাট দিন পর্যন্ত নিফাস হয়ে থাকে। এটি একটি বাস্তব বিষয়। কোনো কোনো মহিলার ষাট দিন পর্যন্ত নিফাস হওয়ার অভ্যাস রয়েছে।

অতএব উপরোক্ত আলোচনারভিত্তিতে বলতে পারি যে, ষাট দিন পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত সে অপেক্ষা করবে। এরপর সে তার স্বাভাবিক হায়িযের দিকে ফিরে যাবে এবং মাসিকের সাধারণ সময় অপেক্ষা করবে। অতঃপর গোসল করে পবিত্র হয়ে নামায-রোযা আদায় করবে। এখন থেকে তাকে মুস্তাহাযা হিসেবে গণ্য হবে। তবে অধিকাংশ আলেমের মতে চলিশ দিনের বেশি নিফাসের রক্ত চলতে থাকলে তাকে নিফাস হিসেবে গণ্য করা হবে না; বরং তাকে ইস্তেহাযা হিসেবে গণ্য করতে হবে। আল্লামা বিন বায (রাহিমাহুল্লা-হ) এ মতকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। ***(দেখুন: ফাতাওয়া উসাইমীন- নং ১৮০)***

জিজ্ঞাসা (২০): ***একটি বড় পুকুরে অনেকেই গোসল এবং ওযূ করে। থালা বাসনও মাজে। কিন্তু আমি দেখলাম ওই পুকুরে কুকুর গা ঢুকিয়ে বসে থাকে এবং পুকুরের পানি পান করে। আমার প্রশ্ন ওই পুকুরে গোসল এবং ওযূ বা বাসন, কাপড় ধোয়া যাবে কি-না? কুকুর কোনো পাত্রে মুখ দিলে সাতবার ধুতে হয়। এ ক্ষেত্রে করণীয় কি? কুরআন ও হাদীসের আলোকে জবাব দিয়ে উপকৃত করবেন –ইন্‌শা-আল্লাহ।***

রায়হান আহমেদ
ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

জবাব: আসলে কুকুর পাত্রে মুখ লাগানো এবং বড় বড় পুকুরে কিংবা খাল-বিলে মুখ লাগানোর মধ্যে পার্থক্য আছে। পাত্রে মুখ ধুলে পাত্রের পানি বা খাবার ফেলে দিতে হবে এবং সাতবার ধৌত করতে হবে। আর পুকুরে যেহেতু পানির পরিমাণ বেশি থাকে, তাই পাত্রের হুকুম পুকুরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না। অর্থাৎ- যেই পুকুরে কুকুর মুখ লাগিয়ে পানি খায়, সেখানে ওযূ-গোসলসহ সবকিছু করা যাবে। ☒

প্রচ্ছদ রচনা

বজরা শাহী মসজিদ

–আব্দুল মোহাইমেন সা'আদ*

বাংলাদেশের নোয়াখালী জেলার সোনাইমুড়ী উপজেলার বজরা ইউনিয়নে অবস্থিত বজরা শাহী মসজিদ মোগল স্থাপত্যের এক অনন্য নিদর্শন হিসেবে দেশবাসীর কাছে পরিচিত। অষ্টাদশ শতাব্দীতে নির্মিত এই মসজিদ বাংলাদেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের অন্যতম উল্লেখযোগ্য স্থাপনা। দিল্লির শাহী জামে মসজিদের আদলে নির্মিত এই মসজিদটির মনোমুগ্ধকর সৌন্দর্য এবং ঐতিহাসিক গুরুত্বের কারণে এটি দেশি-বিদেশি পর্যটকদের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে।

ইতিহাস ও নির্মাণ

বজরা শাহী মসজিদ মোগল সম্রাট মুহাম্মদ শাহের রাজত্বকালে ১৭৪১-১৭৪২ খ্রিষ্টাব্দে আমান উল্লাহ কর্তৃক নির্মিত হয়। মসজিদটি নির্মাণের পেছনে কিছু আকর্ষণীয় তথ্য লুকিয়ে আছে। জমিদার আমান উল্লাহ তার বাড়ির সম্মুখে ৩০ একর জমির ওপর উঁচু পাড়যুক্ত একটি বিশাল দিঘি খনন করেন। এই দিঘির পশ্চিম পাড়ে মনোরম পরিবেশে আকর্ষণীয় তোরণ বিশিষ্ট প্রায় ১১৬ ফুট দৈর্ঘ্য, ৭৪ ফুট প্রস্থ এবং প্রায় ২০ ফুট উঁচু তিন গম্বুজ বিশিষ্ট ঐতিহাসিক বজরা শাহী মসজিদ নির্মাণ করেন। মসজিদটি নির্মাণ করতে সময় লেগেছে ২৬ বছর।

স্থাপত্য শৈলী

মসজিদটির স্থাপত্য শৈলী মোগল স্থাপত্যের প্রভাব বহন করে। এর চারপাশ প্রাচীর দিয়ে ঘেরা এবং মসজিদের মূল প্রবেশপথ পূর্ব দিকে অবস্থিত। আয়তাকার মসজিদটি উত্তর দক্ষিণে লম্বা। মসজিদের পূর্বে তিনটি, উত্তরে ও দক্ষিণে একটি করে মোট পাঁচটি দরজা রয়েছে। মসজিদের পূর্বদিকের মধ্যের দরজায় একটি ফারসি ফলকে এর নির্মাণকাল ও নির্মাতার নাম লেখা রয়েছে। মসজিদের ভেতরের পশ্চিম দেয়ালে তিনটি মিহরাব অত্যন্ত কারুকার্যময়। মসজিদের চার কোণে চারটি সুন্দর মিনার রয়েছে যা এর সৌন্দর্যকে বহুলাংশে বৃদ্ধি করেছে। মসজিদের পূর্বদিকে বিরাট তোরণের উপরে মনোরম উঁচু মিনার রয়েছে। মসজিদের সৌন্দর্য বাড়াতে চীন থেকে আনা বিশেষ ধরনের কাচ দিয়ে মসজিদের দেয়াল সাজানো হয়েছে।

ঐতিহাসিক গুরুত্ব

বজরা শাহী মসজিদ বাংলাদেশের ইসলামি স্থাপত্যের ইতিহাসে এক বিশেষ স্থান দখল করে আছে। মসজিদটি মোগল আমলের স্থাপত্য শৈলীর একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ। শুধুমাত্র ধর্মীয় কাজের জন্যই নয়; বরং এই মসজিদটি আমাদের ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক পরিচয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

বর্তমান অবস্থা

বর্তমানে বজরা শাহী মসজিদ বাংলাদেশ প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের তত্ত্বাবধানে রয়েছে। বিভাগটি মসজিদের সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

কীভাবে যাবেন

ঢাকা থেকে নোয়াখালী সদরে যাওয়ার পথে সোনাইমুড়ী উপজেলার বজরা বাজারে গাড়ি থেকে নেমে পায়ে হেঁটে অথবা রিকশায় করে কয়েক মিনিটে চলে যেতে পারবেন এই ঐতিহাসিক স্থাপনাটিতে।

উপসংহার

বজরা শাহী মসজিদ বাংলাদেশের ইতিহাস ও সংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এই মসজিদটি শুধুমাত্র মুসলিমদের জন্য নয়, সকল ধর্মের মানুষের জন্য একটি দর্শনীয় স্থান। মসজিদটির সৌন্দর্য ও ঐতিহাসিক গুরুত্ব এটিকে বাংলাদেশের একটি অন্যতম আকর্ষণীয় পর্যটন স্থান করে তুলেছে। ☒

* *শিক্ষার্থী, কবি নজরুল সরকারি কলেজ, ঢাকা।*

অক্টোবর

তারিখ	ফজর	সূর্যোদয়	যোহর	আসর	মাগরিব	ঈশা
০১	০৪:৩০	০৫:৪৯	১১:৪৯	০৩:১২	০৫:৪৭	০৭:১৭
০২	০৪:৩১	০৫:৫০	১১:৪৯	০৩:১২	০৫:৪৬	০৭:১৬
০৩	০৪:৩১	০৫:৫০	১১:৪৮	০৩:১১	০৫:৪৫	০৭:১৫
০৪	০৪:৩১	০৫:৫১	১১:৪৮	০৩:১১	০৫:৪৪	০৭:১৪
০৫	০৪:৩২	০৫:৫১	১১:৪৮	০৩:১০	০৫:৪৩	০৭:১৩
০৬	০৪:৩২	০৫:৫১	১১:৪৮	০৩:০৯	০৫:৪২	০৭:১২
০৭	০৪:৩২	০৫:৫২	১১:৪৭	০৩:০৯	০৫:৪১	০৭:১১
০৮	০৪:৩৩	০৫:৫২	১১:৪৭	০৩:০৮	০৫:৪০	০৭:১০
০৯	০৪:৩৩	০৫:৫২	১১:৪৭	০৩:০৮	০৫:৩৯	০৭:০৯
১০	০৪:৩৪	০৫:৫৩	১১:৪৬	০৩:০৭	০৫:৩৮	০৭:০৮
১১	০৪:৩৪	০৫:৫৩	১১:৪৬	০৩:০৬	০৫:৩৭	০৭:০৭
১২	০৪:৩৪	০৫:৫৪	১১:৪৬	০৩:০৬	০৫:৩৬	০৭:০৬
১৩	০৪:৩৫	০৫:৫৪	১১:৪৬	০৩:০৫	০৫:৩৫	০৭:০৫
১৪	০৪:৩৫	০৫:৫৫	১১:৪৫	০৩:০৫	০৫:৩৪	০৭:০৪
১৫	০৪:৩৬	০৫:৫৫	১১:৪৫	০৩:০৪	০৫:৩৪	০৭:০৪
১৬	০৪:৩৬	০৫:৫৫	১১:৪৫	০৩:০৪	০৫:৩৩	০৭:০৩
১৭	০৪:৩৬	০৫:৫৬	১১:৪৫	০৩:০৩	০৫:৩২	০৭:০২
১৮	০৪:৩৭	০৫:৫৬	১১:৪৫	০৩:০৩	০৫:৩১	০৭:০১
১৯	০৪:৩৭	০৫:৫৭	১১:৪৪	০৩:০২	০৫:৩০	০৭:০০
২০	০৪:৩৮	০৫:৫৭	১১:৪৪	০৩:০১	০৫:২৯	০৬:৫৯
২১	০৪:৩৮	০৫:৫৮	১১:৪৪	০৩:০১	০৫:২৮	০৬:৫৮
২২	০৪:৩৮	০৫:৫৮	১১:৪৪	০৩:০০	০৫:২৮	০৬:৫৮
২৩	০৪:৩৯	০৫:৫৯	১১:৪৪	০৩:০০	০৫:২৭	০৬:৫৭
২৪	০৪:৩৯	০৫:৫৯	১১:৪৪	০২:৫৯	০৫:২৬	০৬:৫৬
২৫	০৪:৪০	০৬:০০	১১:৪৩	০২:৫৯	০৫:২৫	০৬:৫৫
২৬	০৪:৪০	০৬:০০	১১:৪৩	০২:৫৮	০৫:২৫	০৬:৫৫
২৭	০৪:৪০	০৬:০১	১১:৪৩	০২:৫৮	০৫:২৪	০৬:৫৪
২৮	০৪:৪১	০৬:০১	১১:৪৩	০২:৫৭	০৫:২৩	০৬:৫৩
২৯	০৪:৪১	০৬:০২	১১:৪৩	০২:৫৭	০৫:২৩	০৬:৫৩
৩০	০৪:৪২	০৬:০২	১১:৪৩	০২:৫৬	০৫:২২	০৬:৫২
৩১	০৪:৪২	০৬:০৩	১১:৪৩	০২:৫৬	০৫:২১	০৬:৫১

সূচীপত্র

THE WEEKLY ARAFAT, REG. DA.60 ▪ PRICE Tk.25.00

লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইক
লাব্বাইকা লা-শারীকা লাকা লাব্বাইক
ইন্নাল হামদা ওয়ান নি'মাতা লাকা ওয়াল মুলক
লা-শারীকা লাক

হজ্জ বুকিং চলছে...

ব্যবসা নয় সর্বোত্তম সেবা প্রদানের মানসিকতা নিয়ে আপনার কাঙ্খিত স্বপ্ন হজ্ব পালনে আমরা আন্তরিকভাবে আপনার পাশে আছি সবসময়

অভিজ্ঞতা আর হাজীদের ভালোবাসায় আমরা সফলতা ও সুনামের সাথে পথ চলছি অবিরত

স্বত্বাধিকারী
মুহাম্মাদ এহসান উল্লাহ
কামিল (ডাবল), দাওরায়ে হাদীস।
খতীব, পেয়ালাওয়ালা জামে মসজিদ, বংশাল, ঢাকা
০১৭১১-৫৯১৫৭৫

আমাদের বৈশিষ্ট্য:
- রাসুলের (সা:) শিখানো পদ্ধতিতে সহীহভাবে হজ্ব পালন।
- সার্বক্ষণিক দেশবরেণ্য আলেমগণের সান্নিধ্য লাভ এবং হজ্জ, ওমরাহ ও তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর পর্ব।
- হজ্ব ফ্লাইট চালু হওয়ার তিনদিনের মধ্যে হজ্ব ফ্লাইট নিশ্চিতকরণ।
- প্রতি বছর অভিজ্ঞ আলেমগণকে হজ্ব গাইড হিসেবে হাজীদের সাথে প্রেরণ।
- হারাম শরীফের সন্নিকটে প্যাকেজ অনুযায়ী ফাইভ স্টার, ফোর স্টার ও থ্রী স্টার হোটেলে থাকার সুব্যবস্থা।
- মক্কা ও মদিনার ঐতিহাসিক ও দর্শনীয় স্থানসমূহ যিয়ারতের সুব্যবস্থা।
- হাজীদের চাহিদামত প্যাকেজের সুব্যবস্থা।
- খিদমাত, সততা, দক্ষতা ও জবাবদিহিতার এক অনন্য প্রতিষ্ঠান।

HAS
মেসার্স হলি এয়ার সার্ভিস
MEMBER
ATAB MEMBER
সরকার অনুমোদিত হজ্ব, ওমরাহ ও ট্রাভেল এজেন্ট, হজ্ব লাইসেন্স নং- ৯৩৮
হেড অফিস: ১/২ পশ্চিম হাজীপাড়া, রামপুরা, ঢাকা। গুলজার কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স, ৭'ম তলা (লিফেটর ৬) (হাজীপাড়া পেট্রোল পাম্পের বিপরীতে)
মোবাইল : ০১৭১১-৫৯১৫৭৫, ০১৬৭৪-৬৯৫৯৯৬
www.holyairservice.com holyairservice@yahoo.com
www.facebook.com/holyairservice

প্রফেসর ড. এম.এ. বারীর পক্ষে **অধ্যাপক ডক্টর আব্দুল্লাহ ফারুক** কর্তৃক **আল হাদীস প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং** হাউজ: ৯৮, নওয়াবপুর রোড, ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ হতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত